জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ

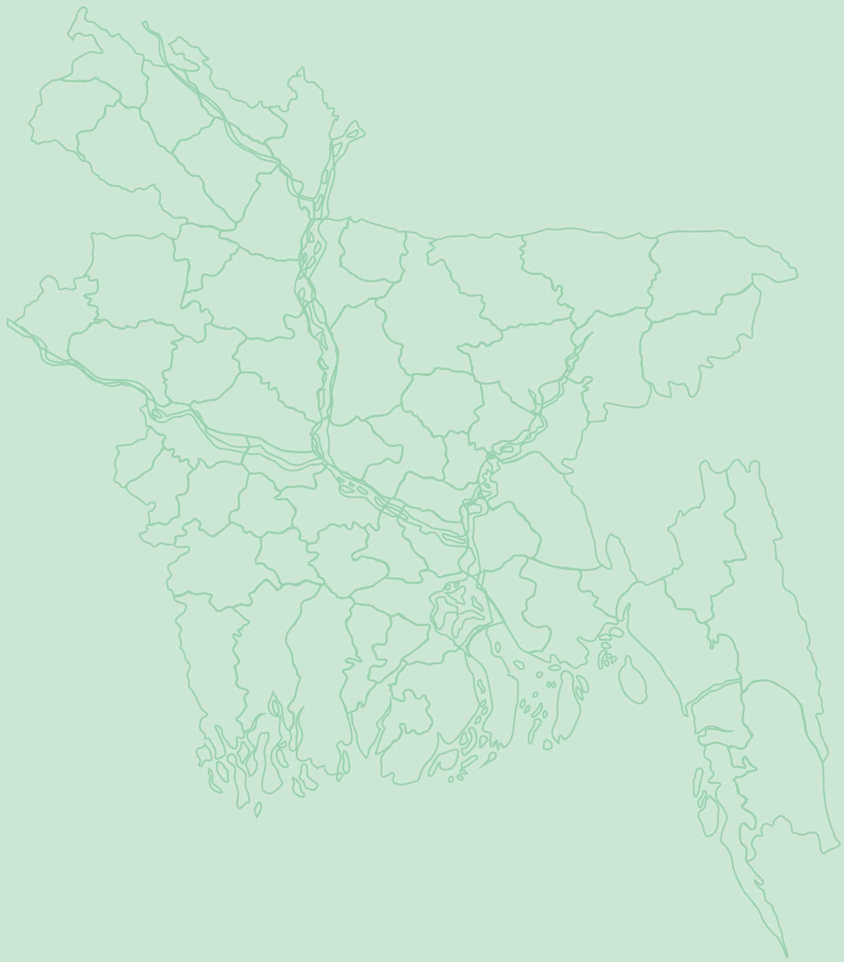

জুলাই ২০১৫

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, 2015-এর বাংলা ভাষ্য ।
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ।

A Note on this Edition: Cabinet Approved the "National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh" on 1st June 2015. The document is available in the Planning Commission website: www.plancomm.gov.bd/nsss/ for general access. Bangla version of the "National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh" is printed with support from the Social Security Policy Support Programme.

Published and Cover designed by
General Economics Division (GED)
Planning Commission
Government of the People's Republic of Bangladesh

বাংলা ভাষ্য পুনঃ মুদ্রণ কাল: অক্টোবর ২০১৭
মুদ্রণ সংখ্যা: ৫,৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশত) কপি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ

(মূল ইংরেজি দলিলের বাংলা ভাষ্য)

জুলাই ২০১৫

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের জাতীয় সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। এ কথা মনে রেখেই সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা জনগণকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে। এ কৌশলের প্রধান রূপকল্প হচ্ছে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করতে দেশের সকল উপযুক্ত নাগরিকদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বাংলাদেশকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার আমাদের রয়েছে। তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সামর্থ্য সরকারের রয়েছে।

'রূপকল্প ২০২১' এবং সংশ্লিষ্ট 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' এ বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে যেখানে প্রবৃদ্ধি হবে সমতাভিত্তিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা হবে সহজলভ্য এবং গণতন্ত্র হবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'রূপকল্প ২০২১' কে কেন্দ্র করেই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে; এর সফল বাস্তবায়ন আমাদেরকে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০১৫ সালে প্রায় ২৪.৮ শতাংশ হয়েছে এবং একই সময়কালে চরম দারিদ্র্যের হার ৩৪.৩ শতাংশ থেকে কমে ১২.৯ শতাংশ হয়েছে। একশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপি ক্লাবের সদস্য হতে বাংলাদেশের লেগেছিল দীর্ঘ ৩৮ বছর; কিন্তু ২০১৫-১৬ সালেই ২০০ বিলিয়ন ডলার জিডিপি ক্লাবের সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। একইভাবে পূর্বে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করতে ২০ বছর লাগলেও এবার মাত্র সাত বছরে আমরা মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করেছি। এমন অগ্রগতির প্রভাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এরপরও মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও দারিদ্র্যে নিপতিত রয়েছে। এ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকা পড়ে থাকবে যা দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করবে।

২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'স্কেলিং আপ সোশাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে আমি বলেছিলাম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বেড়েছে এবং এটি দারিদ্র্য হার হ্রাসের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আমাদের কর্মসূচিসমূহের উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদেরকে মধ্যম আয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অর্জিত অতীত সাফল্যকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের মূল কারণগুলো বের করে সেগুলোর সমাধান এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের ঝুঁকির প্রভাব কমানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত সাফল্যকে আরও গভীরতর ও বিস্তৃত করতে চায় সরকার। এসব ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনায় জনগণের জন্য সরকারি সহায়তার প্রতিফলন হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল চূড়ান্ত হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। একটি দীর্ঘ দিনের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি আশা করছি, বাংলাদেশের মঙ্গলের স্বার্থে, বাংলাদেশকে জাতির জনকের বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলায়' পরিণত করতে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উচ্চাসনে আসীন করতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে জনগণকে আমরা পাশে পাব।

(মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত)

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শেখ হাসিনা)

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা - 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করেছে যার উপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকার জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল ২০১০-২১ অনুমোদন করেছে। এসব পরিকল্পনা ও কৌশল আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতি রেখেই করা হয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১' এ ন্যায্যতার ভিত্তিতে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথনকশা দেয়া হয়েছে এবং দারিদ্র্য, অসমতা ও মানবিক বৈষম্য দূরীকরণের কৌশল বিবৃত হয়েছে।

দারিদ্র্য, বিপদাপন্নতা ও প্রান্তিকীকরণ-এই ত্রয়ী সমস্যা মোকাবেলার একটি মূল কৌশল হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বকে স্বীকার করে বাংলাদেশ সে অনুযায়ী কাজ করছে। দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ, যোগানকে ছাপিয়ে যাওয়া চাহিদা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিকাশমান প্রভাব ইত্যাদি কারণে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বর্তমান কর্মসূচিগুলোকে প্রধান প্রধান ঝুঁকিসমূহের আলোকে সংহতকরণ ও যৌক্তিকীকরণের সুযোগ রয়েছে। গত দশকগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম প্রতিবছরই ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বর্তমানে ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ১৪৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি চালু আছে এবং এসব কর্মসূচিতে ব্যয়িত হচ্ছে জিডিপির প্রায় ২.০২ শতাংশ অথবা সরকারের বাজেটের প্রায় ১৩ শতাংশ। অপরিকল্পিতভাবে কর্মসূচিগুলোর বৃদ্ধির ফলে এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া ত্রুটিপূর্ণ টার্গেটিং, অপচয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয়-ভিত্তিক সমন্বয়ের অভাবে কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ঘটছে এবং সুবিধাভোগীর আওতা তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে দেখা যায়, দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য নেয়া এসব কর্মসূচির আওতা বেড়েছে এবং কর্মসূচিগুলো দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করেছে। তথ্য-উপাত্ত থেকে আরও দেখা যায়, দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও এসব কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে। গড় সুবিধার পরিমাণ কম এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই সুবিধার পরিমাণ কমেছে। ফলস্বরূপ, দারিদ্র্য হ্রাসের উপর এসব কর্মসূচির প্রভাব একটি অধিকতর কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে প্রভাব রাখতে পারে তার চেয়ে কম।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক ও সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের বিকাশমান প্রয়োজন মোকাবেলায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমাকে অন্তর্ভুক্ত করে সংকীর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণার তুলনায় এ কৌশল সামাজিক সুরক্ষার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি ও আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং কর্মসূচিসমূহে পরিকল্পনা উন্নতকরণের মাধ্যমে বর্তমান কৌশলপত্রটি আয় বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে এবং মানব উন্নয়ন জোরদারকরণের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।

এ কৌশলে কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি ও ফলাফল পরিবীক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবে এবং কর্মসূচিসমূহের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সহায়তা করবে। কৌশল বাস্তবায়নের এরূপ পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে।

আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি এ কৌশলটি চূড়ান্ত হয়েছে দেখে। এ কৌশল প্রণয়নের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত আমার সহকর্মীদের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত)

(আ হ ম মুস্তফা কামাল)

এম এ মান্নান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল চূড়ান্ত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশা করছি, অতি শীঘ্রই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের স্বপ্নপূরণে সক্ষম হবো। মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার পাশাপাশি মাঝারি আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ ও তা ধরে রাখতে যে পর্যায়ের দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করা দরকার তা অর্জনে সহায়তা করবে। এছাড়া অনিবার্য অর্থনৈতিক রূপান্তরকরণের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন ঝুঁকি প্রশমনেও তা সহায়তা করবে।

সরকার, বিভিন্ন অংশীজন, উন্নয়ন সহযোগী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফসল এই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল। এ অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগীদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

(মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত)

(এম এ মান্নান)

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভুইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির অঙ্গনে একটি ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলোর জন্য একটি সুগঠিত পদ্ধতি অনুসরণের গুরুত্ব ক্রমবর্ধিতভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর এবং বেষ্টনী ও সোপানের কৌশলসমূহের মতো ধারণা সামাজিক নিরাপত্তাকে উন্নয়ন এজেন্ডার মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকিপ্রবণতা উপশমে এবং তীব্র দরিদ্রতা সমাধানে ও মানুষের প্রান্তিকীকরণ কমানোর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একইভাবে, দূরদর্শী ও কাঙ্ক্ষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন কৌশল অর্থনীতির রূপান্তরের নীতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা বাংলাদেশ তার উন্নয়নের প্রক্রিয়াতে অনুসরণ করে আসছে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে বিভিন্ন প্রতিকূলতা নিয়ে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। চার দশক পরে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্নমাত্রার সফল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাফল্যের প্রতিবেদনে তা স্পষ্ট। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২৪ শতাংশ হয়েছে। কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন বেড়ে তিনগুণের বেশি হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। সবার জন্য পয়ঃনিস্কাশন নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উল্লিখিত স্থিতিশীল সাফল্য এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের মূল উপাদান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিবর্ধিত পদ্ধতি দুর্যোগ পরবর্তী মৃত্যু ও ক্ষুধার চক্রকে কার্যত উচ্ছেদ করেছে। ঝুঁকিপ্রবণতার কর্মসূচির প্রবৃদ্ধি দরিদ্রদের যে অংশকে বিদ্যমান কর্মসূচির আওতাভুক্ত করতে পারেনি তাদেরকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসূচিসমূহের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশ যা শুধুমাত্র দুর্যোগকালীন করুণার প্রতিচ্ছবি ছিল তা এখন বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে।

যদিও বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আর্থিক অঙ্গীকার এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি স্থাপন করেছে, তথাপি পুরো পদ্ধতি এখনো দারিদ্য এবং ঝুঁকিপ্রবণতার উপরে প্রভাবের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনার নিচেই রয়ে গেছে। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তার চিত্র সত্যিকার অর্থে প্রত্যাশিত পর্যায়ের চাইতে কম। তথাপি, কর্মসূচির মূল্যায়ন স্তরে কর্মসূচিভেদে কৃতিত্বের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূল্যায়নের ফলাফল আমাদেরকে এটাই পরামর্শ দেয় যে, যখন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় তখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ সুবিধাভোগীদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সামগ্রিক কৌশলগত কাঠামো প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছে। এ সামগ্রিক কৌশল প্রণয়নে ধারণাগত কাঠামোয় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হলো : (ক) এ পর্যন্ত আমাদের অর্জিত সাফল্য; (খ) পদ্ধতিগত সঙ্গতি ও নীতি দৃশ্যমান্যতার অগ্রাধিকার;

(গ) কর্মসূচিসমূহের ক্রমবর্ধমান কিন্তু পদ্ধতিগত উন্নতি অনুধাবন; (ঘ) নতুন রীতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং (ঙ) সক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য ও ঝুঁকিপ্রবণতা অনুধাবনের মাধ্যমে শক্তিশালী কর্মসূচির উদ্যোগ নিশ্চিত করা ।

বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল দেশীয় প্রেক্ষাপটে নিজস্ব গভীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত করা হয়েছে । আমি এই কৌশলপত্র প্রণয়নের অংশ হতে পেরে গর্বিত এবং যারা এটি প্রণয়নে অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই । বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কর্মকর্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই যারা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং যা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে ।

(মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত)

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভুইঞা)

প্রফেসর শামসুল আলম, পিএইচডি
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
পরিকল্পনা কমিশন

প্রাক-কথন

২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সরকার বাংলাদেশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে একটি জাতীয় কৌশল প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি ইস্তেহারে বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তায় বর্তমানে যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে বরাদ্দ দেয়া হবে তার উত্তম ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের সুযোগ পরিহার করার সামর্থ্য আমাদের দেশের নেই। উক্ত সম্মেলনে সামাজিক নিরাপত্তার যেসব মুখ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয় তা হলো: সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের উন্নয়ন, কর্মসূচির উত্তম নকশা প্রণয়ন ও অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ও উপকারভোগীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে জোরদারকরণ এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে যথাযথ ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রণয়ন।

নিরাপত্তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ব্যাপকভিত্তিক ও বর্ধিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দারিদ্র্য হ্রাসের জন্যও কার্যকর। সরকারি ইস্তেহারে দু'স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়: ফলপ্রসূ কর্মসূচিগুলোকে বর্ধিতকরণ এবং বিকাশমান ক্ষেত্রসমূহের (যেমন, শিশু পুষ্টি, নগর দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য) উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিগুলোকে আরো সংহতকরণ। অকার্যকর ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে বরং প্রয়োজনীয় এবং প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলোর একটি সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১২ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। এ কমিটির দায়িত্ব ছিল কৌশলের খসড়া প্রণয়নের কাজ তদারকি করা, আর পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব ছিল উক্ত কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা এবং কৌশল প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নেয়া। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ন্যায্য আয়বন্টনের লক্ষ্যে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সফলতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষার বিধানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন।

২০১৩ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক পেপার প্রস্তুত করা হয় যেখানে সামাজিক নিরাপত্তায় বিদ্যমান জ্ঞানের অভাব ও প্রধান করণীয় বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং সেটি কৌশল প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়গুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক উন্নত জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়। এ কৌশলকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে ১০টি গবেষণাপত্র তৈরি করা হয়। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে অনেকগুলো পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণাপত্রগুলোকে চূড়ান্ত করতে তিনটি বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। মতামত ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দেশের গাজীপুর, খুলনা, রংপুর ও সিলেটে চারটি আঞ্চলিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সহায়তায় দু'টি জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়:

একটি পরামর্শ সভা বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বেসরকারি খাতের ব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যম ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে এবং অন্যটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মাননীয় মন্ত্রীদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এসব মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং কৌশলের নীতি ও কাঠামো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সহায়ক ছিল।

ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর মূল বিষয়বস্তু হলো জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো লক্ষ্য করে কর্মসূচিসমূহ সংহতকরণ অর্থাৎ শিশু, কর্মোপযোগী মানুষ, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রাক-শৈশবকালে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর যে অভাব রয়েছে জীবনচক্র পদ্ধতিতে তাও অন্তর্ভুক্ত হয়। কৌশলপত্রে নানাবিধ সামাজিক বৈষম্যের শিকার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সমাজের অন্য সবার ন্যায় এসব দলেরও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় সমান সেবা লাভের সুযোগ রয়েছে। সরকার তা নিশ্চিত করবে। অধিকন্তু সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের বিশেষ প্রয়োজনকে আমলে নিয়ে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হবে।

দেশের সংবিধানে বর্ণিত বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এ কৌশলের দূরদৃষ্টি হচ্ছে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতির দিকে ধাবিত হওয়া এবং তাই "বাংলাদেশের সকল যোগ্য নাগরিকের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করবে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।" কৌশলটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলোতে চরম দারিদ্র্য নির্মূলকরণে সহায়তা করতে হতদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের উপর জোর দেয়া হবে।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (এসডিএফ) অন্তর্ভুক্ত নীতি ও কর্মসূচিসমূহের অংশ। এসডিএফ হলো একটি বড় ছাতা যার ছায়াতলে রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পয়:নিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ক ঘোষিত কৌশলসমূহ। এ কাঠামোর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একগুচ্ছ নীতির ব্যবস্থা করা যা উন্নয়ন প্রয়াসের প্রেক্ষিতে অধিকতর সমতা ও ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন কার্যক্রম বিভিন্ন অংশীজনের যেমন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হয়েছে। আমি তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের অবদান উল্লেখ না করলেই নয় যিনি কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে আমাদের পাশে ছিলেন এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে বুদ্ধি, পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তার সহযোগিতা ছাড়া এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বর্তমান রূপ নিতে পারতো না। সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।

(মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত)

(প্রফেসর শামসুল আলম)

সূচিপত্র

সারণি তালিকা ---------- xiii

লেখচিত্র তালিকা ---------- xiv

ক. পটভূমি ---------- xv

খ. দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত অতীত সাফল্য এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ---------- xvi

গ. বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ ও কার্যসম্পাদন ---------- xvii

ঘ. বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ ---------- xvii

ঙ. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় ---------- xix

চ. প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ---------- xix

ছ. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন ---------- xxiii

জ. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবাপ্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ---------- xxiv

ঝ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ---------- xxv

প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ ---------- xxvi

অধ্যায় ১: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের পটভূমি ---------- ১

১.১ পটভূমি ---------- ১

১.২ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো ---------- ২

১.৩ দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি ---------- ৩

১.৪ বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ---------- ৫

১.৫ দারিদ্র্যের উপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব ---------- ১২

১.৬ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ---------- ১৪

১.৭ সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার উপায় ---------- ১৫

অধ্যায় ২: দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ঝুঁকি এবং বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগসমূহের যথার্থতা ---------- ১৭

২.১ ভূমিকা ---------- ১৭

২.২ জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ---------- ১৭

২.২.১ গর্ভধারণ এবং শৈশবকাল ---------- ১৭

২.২.২ বিদ্যালয় গমনকাল ---------- ১৮

২.২.৩ তরুণ জনগোষ্ঠী ---------- ১৯

২.২.৪ কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠী ---------- ১৯

২.২.৫ প্রতিবন্ধিতা ---------- ২০

২.২.৬ বার্ধক্য ---------- ২১

২.৩ সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দারিদ্র্য পরিস্থিতি ---------- ২২

২.৩.১ নগর দরিদ্র ---------- ২২

২.৩.২ অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ---------- ২৩

২.৪ ঝুঁকি মোকাবেলা: স্বকীয় এবং যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ও অভিঘাত ---------- ২৫

২.৪.১ মৌসুমী দারিদ্র্য ---------- ২৫

২.৪.২ খাদ্য মূল্য জনিত অভিঘাত ---------- ২৬

২.৪.৩ অর্থনৈতিক মন্দা ---------- ২৬

২.৫ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকির বিপরীতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের ম্যাপিং ---------- ২৬

২.৫.১ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থান ---------- ২৬

২.৫.২ প্রাক-শৈশবকাল ---------- ২৭

২.৫.৩ স্কুলগামী ছেলেমেয়ে ---------- ২৯

২.৫.৪ কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠী (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ) ---------- ৩০

২.৫.৫ কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বাদ পড়া কর্মসূচিসমূহ ---------- ৩০

২.৫.৬ বয়স্কদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৩০

২.৬ যৌথ ঝুঁকি প্রশমনে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ---------- ৩১

২.৬.১ দুর্যোগজনিত ঝুঁকি প্রশমনমূলক কর্মসূচিসমূহ ---------- ৩১

২.৭ নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বর্তমান সংস্থান ---------- ৩২

২.৮ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ---------- ৩৫
২.৮.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচিসমূহ ---------- ৩৫
২.৮.২ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৩৫
২.৮.৩ এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্তদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৩৫
২.৮.৪ প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৩৬
২.৮.৫ দারিদ্র্যে নিপতিত নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি ---------- ৩৬

অধ্যায় ৩: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড ---------- ৩৮
৩.১ ভূমিকা ---------- ৩৮
৩.২ উচ্চ ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গঠন ও ধরন ---------- ৩৮
৩.৩ স্বেচ্ছামূলক (কন্ট্রিবিউটরি) ও সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহ ---------- ৪০
৩.৪ কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই ---------- ৪১
৩.৫ সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমবাজার ---------- ৪১
৩.৬ সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ---------- ৪৩
৩.৬.১ স্টাফ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারিত্বকরণ ---------- ৪৩
৩.৬.২ তথ্য ব্যবস্থাপনায় ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ---------- ৪৩
৩.৬.৩ সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদানের জন্য আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ---------- ৪৪

অধ্যায় ৪: সামাজিক নিরাপত্তার কৌশলগত ধারণা ও প্রস্তাবনা ---------- ৪৬
৪.১ ভূমিকা ---------- ৪৬
৪.২ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যসমূহ ---------- ৪৭
৪.৩ সামাজিক নিরাপত্তার জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা সংহতকরণ ---------- ৪৮
৪.৩.১ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা ---------- ৪৮
৪.৩.২ কর্মোপযোগীদের জন্য (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ) কর্মসূচি ---------- ৫১
৪.৩.৩ বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ---------- ৫৪
৪.৩.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ---------- ৫৬
৪.৩.৫ সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব ---------- ৫৮
৪.৪ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ---------- ৫৮
৪.৫ নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ---------- ৫৮
৪.৬ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণ ---------- ৫৯
৪.৭ যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতা জোরদারকরণ ---------- ৫৯
৪.৮ বিশেষ কর্মসূচি ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণ ---------- ৬০

অধ্যায় ৫: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন ---------- ৬২
৫.১ সার্বিক চিত্র ---------- ৬২
৫.২ প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহের ব্যয় প্রাক্কলন ঃ বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ ---------- ৬২
৫.২.১ বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা ---------- ৬৬
৫.২.২ প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৬৬
৫.২.৩ শিশুদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৬৭
৫.২.৪ নারীদের জন্য কর্মসূচি ---------- ৬৭
৫.৩ প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও অর্থের প্রাপ্যতা ---------- ৬৭
৫.৩.১ পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয় ঃ জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ পরিচালনার জন্য মোট ব্যয় ---------- ৬৭
৫.৩.২ পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয় ঃ যৌথ ঝুঁকি প্রশমন, বিশেষায়িত ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ ---------- ৬৮
৫.৩.৩ অর্থায়ন প্রাপ্যতা ও অর্থায়নের ভারসাম্য ---------- ৬৯
৫.৪ দারিদ্র্য হ্রাসে প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা ---------- ৭০

অধ্যায় ৬: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ---------- ৭২
৬.১ পর্যালোচনা ---------- ৭২
৬.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতি ---------- ৭২
৬.৩ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবা প্রদান শক্তিশালীকরণ ---------- ৭৫
৬.৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবা প্রদানে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ---------- ৭৫

সূচিপত্র

৬.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা ---- ৮০

৬.৫ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে সহায়ক সরাসরি সরকার থেকে ব্যক্তি (জি২পি) পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদারকরণ ---- ৮০

৬.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি জোরদারকরণ ---- ৮১

৬.৭ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা ---- ৮২

৬.৮ এনজিওদের সাথে সম্পৃক্ততা ---- ৮২

অধ্যায় ৭: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ---- ৮৩

৭.১ সার্বিক চিত্র ---- ৮৩

৭.২ বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ---- ৮৩

৭.৩ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কৌশল ---- ৮৪

৭.৩.১ কৌশলের অধীনে স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ ---- ৮৪

৭.৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ ---- ৮৫

৭.৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন ---- ৮৬

৭.৪ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ---- ৮৮

৭.৫ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ---- ৯০

৭.৫.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বিভাজন ---- ৯১

৭.৫.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফলের যথাযথ ব্যবহার ---- ৯২

৭.৫.৩ সম্মুখে এগিয়ে যাবার উপায় ---- ৯২

সংযুক্তি ১ ---- ৯৩

পটভূমি পত্রসমূহের তালিকা ---- ৯৩

সারণি তালিকা

সারণি ১.১: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত উদ্ভাবনীসমূহ – একটি সময়চিত্র	৬
সারণি ১.২: সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ের দারিদ্র্যপ্রভাব	১২
সারণি ২.১: জীবনচক্র অনুযায়ী সাজানো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ	২৮
সারণি ২.২: দুর্যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আওতা এবং বাজেট বরাদ্দ	৩১
সারণি ২.৩: উপকারভোগীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে গ্রাম/শহর বিভাজন	৩৩
সারণি ২.৪: আরবান কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট (ইউসিডি)-র বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী খানার সংখ্যা	৩৪
সারণি ২.৫: নগর দরিদ্রদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কভারেজ ও বরাদ্দ	৩৪
সারণি ২.৬: স্থানভেদে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধার বণ্টন	৩৫
সারণি ২.৭: বিভিন্ন নারী লক্ষ্যিত কর্মসূচির কভারেজ ও বরাদ্দ	৩৬
সারণি ৫.১: সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত জীবনচক্রভিত্তিক ও ঝুঁকি প্রশমনমূলক প্রধান প্রধান কর্মসূচি	৬৩
সারণি ৫.২: ভিত্তি-বছর (অর্থবছর ২০১৫-১৬)-এর হিসাবে সরকারি তহবিলে অর্থায়িত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ	৬৮
সারণি ৫.৩: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মসূচিসমূহের ব্যয় নির্ধারণ বা কস্টিং (বিলিয়ন টাকা)	৬৯
সারণি ৫.৪: পুনর্গঠিত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের দারিদ্র্য প্রভাব নির্ধারণে ব্যবহৃত কল্পিত অনুশীলনের ফলাফল	৭১
সারণি ৬.১: বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাজেট বরাদ্দ	৭২
সারণি ৬.২: বৃহৎ আকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ	৭৪

লেখচিত্র তালিকা

চিত্র ১.১: দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা ২০০০-২০১০ ৩
চিত্র ১.২: দারিদ্র্য গভীরতা ও ভোগ ব্যবধান (শতাংশ) ৩
চিত্র ১.৩: দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রগতি - গ্রাম বনাম শহর ৪
চিত্র ১.৪: বিভাগ ওয়ারি দারিদ্র্য প্রবণতা ৪
চিত্র ১.৫: জিডিপি ও মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় ৮
চিত্র ১.৬: প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বণ্টন (২০১২-১৩ অর্থবছরের সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের % হিসেবে) ৯
চিত্র ১.৭: প্রধান কর্মসূচির ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের বণ্টন ১০
চিত্র ১.৮: জীবনচক্রের ঝুঁকিসমূহ ১১
চিত্র ১.৯: উপকারভোগীদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ ১৩
চিত্র ২.১: বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়ে বিশিষ্ট পরিবারে দারিদ্র্য হার, ২০১০ ১৭
চিত্র ২.২: বাংলাদেশে অপুষ্টি হ্রাসের প্রবণতা (২০০৪-১৪) ১৮
চিত্র ২.৩: বয়স গ্রুপ ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার হার (২০১০) ২০
চিত্র ২.৪: প্রতি বয়স গ্রুপে প্রতিবন্ধী লোকের সংখ্যা ২০
চিত্র ২.৫: প্রতিবন্ধিতার শিকার এমন পরিবারে দারিদ্র্যের হার, বয়স গ্রুপ ভেদে ২১
চিত্র ২.৬: ষাট ও তদুর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার অনুপাত ২১
চিত্র ২.৭: দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত ২২
চিত্র ২.৮: বিভিন্ন বয়স গ্রুপের বয়স্ক মানুষের মাঝে দারিদ্র্যহার ২২
চিত্র ২.৯: নগর, গ্রামীণ ও জাতীয় দারিদ্র্যের ধারা (১৯৯১ - ২০১০) ২৩
চিত্র ২.১০ অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপ-বৃত্তির পরিমাণ ২৯
চিত্র ২.১১: অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের স্কিমের সাথে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার পরিমাণের তুলনা ৩১
চিত্র ২.১২: সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা গ্রহণকারী খানা (%) ৩৩
চিত্র ৩.১: কতিপয় নির্বাচিত উচ্চ আয়ের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যয় ৩৯
চিত্র ৩.২: দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৪০
চিত্র ৩.৩: বাংলাদেশে প্রতিটি ডেসাইলে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলির মধ্যে যারা কমপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করে তাদের অনুপাত ৪১
চিত্র ৩.৪: দারিদ্র্য হ্রাস ও দারিদ্র্য ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা নির্মাণে শ্রমশক্তিকে সহায়তার চারটি ক্ষেত্র ৪২
চিত্র ৪.১: সরকারের বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ননীতি-ভিত্তিক সহায়তার কেন্দ্রে পরিবার ও ব্যক্তি ৪৬
চিত্র ৪.২: প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৫৬
চিত্র ৫.১: অর্থায়ন কৌশলসমূহ ৬৪
চিত্র ৫.২: প্রক্সি মিনস টেস্ট (পিএমটি)-এর অধীনে বর্জনজনিত ত্রুটি ৭১
চিত্র ৬.১: ধাপ ১: ২০১৫-২০২৫ ৭৭
চিত্র ৬.২: ধাপ-২: ২০২৬ পরবর্তী ৭৮

কৌশলের সার-সংক্ষেপ

ক. পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) দলিলে। এ প্রতিশ্রুতির অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাসে ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগণ যে সকল ঝুঁকিতে রয়েছে তার প্রভাব কমানোর মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাও এর লক্ষ্যভুক্ত। এটি অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের অতীত সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ নানাবিধ কারণে এখনো দারিদ্র্যঝুঁকিতে রয়ে গেছে যাদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্র্যসীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষজন। দেখা গেছে, দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না।

এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তাকল্পে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ থেকে এটাও দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো এসব কর্মসূচির আওতায় আসেনি। তাছাড়া, নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রাপ্ত গড় সুবিধার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রকৃত মূল্যে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের যে প্রভাব থাকা উচিত সে তুলনায় এসব কর্মসুচিতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব অনেক কম।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-কে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) তত্ত্বাবধানে জিইডি এ কৌশল প্রণয়ন করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৌশল প্রণয়নের কর্মপরিধি নির্ধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও এই কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। এ কৌশলের বিষয়বস্তু ও সুপারিশমালা রচনায় সহায়তাকল্পে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মশালা, আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় প্রণীত সম্পূর্ণভাবে একটি দেশজ কৌশল।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলির পরিমার্জন ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলিকে আরও নিখুঁত, দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা এবং ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন নিশ্চিত করা। এটি সনাতনী ধারণার পরিবর্তে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাবে। এই নতুন ব্যবস্থায় ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের (যখন অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে ৫ শতাংশের চেয়ে কম) বাস্তবতায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করার মাধ্যমে এবং কর্মসূচির নকশা ও আদলের উন্নয়ন ঘটিয়ে এ কৌশল একদিকে যেমন আয় বৈষম্য কমাতে সহায়তা করবে, তেমনি অন্যদিকে এটি মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে। সামাজিক নিরাপত্তার এই জাতীয় কৌশলে কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়নি, পাশাপাশি এতে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তলব্ধ জ্ঞান ও ধারণাও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশল প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ১০ টি পটভূমিপত্র (ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার) রচনার উদ্যোগ গৃহীত হয়।

খ. দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত অতীত সাফল্য এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

জনসংখ্যার কত শতাংশ উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থান করে সে বিবেচনায় বলা যায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ যা ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে, এবং ২০১০ সালে তা আরো কমে ৩১.৫ শতাশে এবং ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, চরম দারিদ্র্যের হার, যা নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তা ২০০০ সালের ৩৪.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৭.৬ শতাংশে নেমে এসছে। চরম দারিদ্র্য মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। দারিদ্র্য গভীরতা হ্রাসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ভোগ ব্যবধানও অব্যাহতভাবে কমেছে। ২০০০ সালে দরিদ্র মানুষেরা দারিদ্র্যরেখা দ্বারা সংজ্ঞায়িত মৌলিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট কনসাম্পশন বাস্কেটের চেয়ে গড়ে ২৬ শতাংশ কম ভোগ করে। এ ব্যবধান ২০০৫ সালে ২৩ শতাংশ ছিল যা ২০১০ সালে ২১ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৫ সালে এই ব্যবধান প্রাক্কলিত হিসেবে ১৮ শতাংশের কিছু উপরে।[১]

গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্যের হার এখনো অনেক বেশি। অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যের হারেও একই ধরনের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের সকল বিভাগেই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১১ সনের আদমশুমারির তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস, মানব উন্নয়ন ও দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতির রেকর্ড বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট অর্জন এবং তা জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এসব অগ্রগতি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, দেশের উন্নয়ন কৌশলসমূহ যথাযথ ছিল এবং তা সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও দেশের দারিদ্র্য নির্মূলের পথে ব্যাপক মাত্রার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এসব চ্যালেঞ্জের আবার নানা দিক ও মাত্রা রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা নির্ধারণ ও নকশা প্রণয়নে এসব চ্যালেঞ্জের তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত, দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৫ শতাংশ (৪৭ মিলিয়ন) ২০১০ সালে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করত। প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ সালে এসেও দেশের ২৪.৮ শতাংশ (৩৯.২ মিলিয়ন) মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। ২০১০ সালে মোট জনসংখ্যার ১৭.৬ শতাংশ চরম দারিদ্র্যে নিপতিত ছিল, এবং ২০১৫ সালে এ হার ১২.৯ শতাংশে (২০.৪ মিলিয়ন) এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৮.৬ শতাংশ লোক উচ্চ দারিদ্র্যরেখায় নির্ধারিত সীমার চেয়ে ১.২৫ গুণ কম ভোগ করে। এ জনসংখ্যা অত্যধিক ঝুঁকিগ্রস্ত কারণ যে কোনো অভিঘাত যেমন, বড় ধরনের রোগ-ব্যাধি বা অসুস্থতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃস্থ ঘটনার কারণে এদের একটি ব্যাপক অংশ দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারে। দরিদ্র ও দারিদ্র্য ঝুঁকিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মিলিত অংশের মধ্যে যারা বেশি অভাবী বা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের কাছে পৌছানোই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তৃতীয়ত, স্থান ভেদে (গ্রাম ও শহর এবং বিভাগ) দারিদ্র্য বিন্যাসে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দারিদ্র্য বণ্টনের এই ভৌগোলিক পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে একটি যথাযথ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট কৌশলের নকশা প্রণয়ণ করতে হলে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যেমন জেন্ডার, বয়স, শিক্ষা, সম্পদ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে দারিদ্র্য বিন্যাস পদ্ধতিকে আরও পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। তাৎপর্যের বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলকে দারিদ্র্য বিন্যাস এবং এ সম্পর্কিত ঝুঁকির সঠিক পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

গ. বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ ও কার্যসম্পাদন

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস যা বর্তমান সামাজিক

-

[১] ভোগ ব্যবধানের প্রমিত প্রাক্কলনের জন্য প্রতিটি খানার ভোগ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে ২০১৫ সালে কোনো খানা জরিপ হয়নি,যা থেকে ভোগ ব্যবধান প্রাক্কলন করা যেতে পারে। ভোগ ব্যবধান সম্পর্কিত কোনো তথ্য-উপাত্ত না থাকায় ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের দারিদ্র্য পরিমাপ ব্যবহার করে একটি আনুমানিক প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা গঠন করেছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিগত দশকগুলোতে সরকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অব্যাহত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করতো প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় একটি এককালীনভাতা পেতেন। তবে, ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য নতুন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকাণ্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলি জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলিতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠী ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সামাজসেবামূলক কাজ ছাড়াও সামাজিক অনুদানমূলক কাজও ছিল।

ক্রমান্বয়ে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থ সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে দেয়া হতো। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুর হয়। এনজিও ও সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়; এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান থাকত। এ সকল উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণের সক্ষমতা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

সামাজিক নিরাপত্তাখাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এখাতের বাজেট বরাদ্দ আর্থিক মূল্যে এবং জিডিপির অংশ হিসেবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র ১.৫ -এ দেখানো হয়েছে, ১৯৯৮ সালের জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ ছিল ১.৩ শতাংশ যা ২০১১ সালে বেড়ে ২.৩ শতাংশ হয়েছে। এরপর থেকে এটি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ মোটামুটি মনে হলেও সরকারের বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে এটি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ (সরকারের মোট ব্যয়ের ১৩ শতাংশ) এবং সামাজিক উন্নয়ন নীতির এই ধারার প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশক।

জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে ক্ষুধাভিত্তিক দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাসের মাধ্যমে। এছাড়া অনুকৃতি (সিমিউলেশন প্র্যাকটিস) থেকে দেখা যায় যদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অর্থ ব্যয় করা না হতো, তাহলে মাথাপিছু দারিদ্র্যহার প্রায় ৩৩ শতাংশ হতো, যা বর্তমান দারিদ্র্যহারের চেয়ে ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট বেশি, এবং সেক্ষেত্রে দারিদ্র্যের গভীরতাও বেশি হতো।

অনুকৃতি অনুশীলন (সিমিউলেশন প্র্যাকটিস) থেকে আরও দেখা যায় যে, একটি অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থাতে বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা থাকবে এবং তা মাথাপিছু দারিদ্র্যহার কমানো ও দারিদ্র্যের গভীরতা হ্রাসে আরো ভালো ফলাফল অর্জনে সাহায্য করবে। বিগত বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়লেও দরিদ্র পরিবারগুলির একটি বড় অংশ কোনো ধরনের সামাজিক কর্মসূচির আওতায় আসেনি। আবার, যদি এই ফলাফলকে অধিকাংশ বৃহৎ আকারের কর্মসূচি থেকে প্রদত্ত নিম্ন গড় সুবিধার সাথে সংযোজন করা হয়, তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা এজেন্ডার চ্যালেঞ্জ আরও বেড়ে যায়।

ঘ. বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জটিল– এটি বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এবং অনেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে বাজেটের

অর্থায়নে ১৪৫টি কর্মসূচি রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব কর্মসূচিতে ৩০৬.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় যা জিডিপির ২.০২ শতাংশ। এসব কর্মসূচি ২৩টি বা তারও বেশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

কর্মসূচিসমূহের দ্রুত বিস্তারের কারণে অধিকাংশ কর্মসূচির বাজেট আকারে ছোট এবং সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণও কম। সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বাড়লেও সুবিধাভোগী নির্বাচনের ত্রুটি থাকার কারণে এ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরুপ, ২০১০ সালে ২৪.৫ শতাংশ পরিবার বলেছে যে খানা আয়-ব্যয় জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তত যে কোনো একটি থেকে তারা উপকৃত হয়েছে। এসব পরিবারের মধ্যে ৮২ শতাংশ দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত শ্রেণিভুক্ত এবং প্রায় ১৮ শতাংশ সচ্ছল শ্রেণিভুক্ত।

কৌশলগত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রায় ৬৫ শতাংশ জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়ে গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম। অধিকন্তু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ নামমাত্র সুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ হলেও তারা যে টাকা পায় তা পরিমাণে খুবই কম। টাকার অংক কম হওয়া এমন একটি সমস্যা যা বাংলাদেশের প্রায় সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দেখা যায়।

ক্ষুধা নির্মূল ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর বেশি নজর দেয়ার ফলে কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের হার ও কর্মসূচির অর্থায়ন এ দুটি দিক দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সহায়তা ও পল্লী কর্মসংস্থানভিত্তিক কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গত ১০ বছরে জিডিপির দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও কৃষি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জিত হওয়ায় ক্ষুধা ও খাদ্য দারিদ্র্যের প্রকোপ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষি শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে আসায় প্রকৃত কৃষি মজুরির বেড়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং দারিদ্র্য ঝুঁকির রূপরেখাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এজন্য একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের ধরন বা পর্যাপ্ততার পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বহুলাংশে গ্রামীণ দরিদ্রদের ঝুঁকি হ্রাসের উপর নিবদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবিকাশমান রূপান্তরে জিডিপি-তে ও কর্মসংস্থানে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান কমছে এবং নগর অর্থনীতির অবদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে নগর এলাকার দরিদ্র ও দারিদ্রঝুঁকিপ্রবণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে এসব পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতাকে কৌশলগতভাবে অনুধাবন করা দরকার এবং বসবাসের স্থান বা এলাকা নির্বিশেষে দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিসমূহকে লক্ষ্য করে কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ।

বর্তমানে দেশের শ্রম বাজারে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চায় এবং ইতোমধ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু অর্থনীতির পরিধি ও কর্মকাণ্ড বাড়ছে এবং জিডিপি ও কর্মসংস্থানে আধুনিক শিল্পভিত্তিক ও সংগঠিত সেবা খাতের অংশ বাড়ছে, সেহেতু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় চাহিদাতেও ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। সামাজিক সেবা প্রদানের পদ্ধতি সুরক্ষা বেষ্টনী থেকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিস্তৃত করা প্রয়োজন হবে, এবং একে জীবনচক্র পদ্ধতির সাথে যুক্ত করে এতে কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সাথে, একে আধুনিক নগরভিত্তিক অর্থনীতির চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তৈরি পোশাক খাতে উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ ইতোমধ্যে এধরনের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অভাব। জাতীয় পর্যায়ে বা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচি পর্যায়ে কোনো ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কর্মসম্পাদন নিয়মিত পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন শীর্ষক কিছু সমীক্ষা সীমিত পরিসরে দাতাদের সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। এসব সমীক্ষার ফলাফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের জন্য সুগঠিত ও কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

ঙ. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয়

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতীয় এই কৌশল উপকৃত হয়েছে। প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা যে একটি কার্যকর ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্য মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে এটি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার বিশ্বে এমন প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে, কার্যকর প্রভাব রাখতে হলে যে কোন সামাজিক সুবিধা অনুদানের পরিমাণ এবং কর্মসূচির পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বড় হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশসমূহ সাধারণত অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকেই লক্ষ্য করে কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিণত হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্যের কারণ এবং জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সাধারণত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর সরকার কর্তৃক অর্থায়িত স্কিমসমূহ এবং সামাজিক বিমা স্কিমসমূহের মধ্যে আপেক্ষিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, নাগরিকদের ন্যূনতম পর্যায়ের সুবিধা প্রদানে বিশেষ করে দরিদ্র, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মে নিয়োজিত ও কর্মহীনদের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে করভি-ত্তিক অর্থায়নের প্রয়োজন হয়। সামাজিক বিমা স্কিম তাদের সহায়ক হবে যাদের জীবনচক্র সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি যেমন, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্ঘটনার জন্য অতিরিক্ত বা বাড়তি নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত আয় আছে ।

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশ জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ায় যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহে দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে কীভাবে সর্বোত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করতে বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করতে দেখা গেছে যেমন, কমিউনিটি-ভিত্তিক নির্বাচন, অনিরীক্ষিত নির্বাচন পদ্ধতি (আনভেরিফাইড মিনস টেস্ট) এবং পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি (প্রক্সি মিনস টেস্ট)। তবে সব পরীক্ষাতেই তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রার ভুল সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো একক পদ্ধতির চেয়ে সমন্বিত পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর।

পঞ্চমত, সঠিক ও যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সমন্বয়ক সংস্থা, শক্তিশালী বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পেশাদার কর্মী বাহিনী, সুষ্ঠু তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক লেন-দেন ব্যবস্থা, যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সুবিধাভোগীদের অভিযোগ সমাধানে এসব আপিল ব্যবস্থাগুলোই হলো সুষ্ঠু সামাজিক নিরাপত্তা সেবাপ্রদান ব্যবস্থার যথাযোগ্য উপাদান।

চ. প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: সরকারের অন্যান্য যেসকল নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয়ে বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) গঠিত হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা নীতিকে সেগুলোর একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা যা বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অনেকগুলো নীতি ও কর্মসূচি ও এদের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এসব নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, শিক্ষা কৌশল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশল, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার কৌশল, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল। এসব কর্মসূচি ও কৌশল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং এগুলি দারিদ্র্য হ্রাসের উপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে, দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমায় এবং দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এবং যা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংকট ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠিকে অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো:

> বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র্য ও অসমতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারবে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং আগামী ৫ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে সময়ের প্রয়োজন সে বাস্তবতাকেও বিবেচনায় রাখা হবে। সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক ও 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের উপর জোর দেবে।

আগামী ৫ বছরের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হবে:

> সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যা হতদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করবে।

মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জসমূহ: সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে সেগুলো হলো:

- অপেক্ষাকৃত কম কভারেজ ও অপচয়ের মতো সমস্যা পরিহার করতে ইচ্ছেমাফিক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সর্বজনীন পদ্ধতি গ্রহণ।

- মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে হতদরিদ্র/অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র্য যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

- এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ উপার্জনের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং পরিপূরক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ফলে তাদের জন্য চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে মাতৃত্বকালীন সময়ে।

- এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।

- নগর এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত অধিবাসীদের এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।

- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।

- আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।

জীবনচক্র ঝুঁকিমূহ বিবেচনায় কর্মসূচি সংহতকরণ: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে একীভবনের মাধ্যমে সেগুলিকে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিত করা এবং বেশিসংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটি সম্ভব হবে অগ্রাধিকার স্কিমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হবে না এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয় মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদণ্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে নির্দেশিত ৫টি প্রধান জীবনচক্র কর্মসূচি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

শিশুদের জন্য কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে :

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের নীচের সব শিশুর জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা। এ অনুদান প্রতি পরিবারে অনধিক দুটি শিশুর জন্য সীমিত থাকবে যাতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির উপরে কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব না পড়ে।
- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সব শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
- শিশুদেরকে প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা, ও এতিমদের জন্য কর্মসূচি সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী অভিভাবকদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে আইনী সুরক্ষা প্রদান করা হবে।
- শিশুদের টিকাদান, শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং পুষ্টি প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মক্ষম বয়সীদের জন্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

- তরুণদের শিক্ষা সমাপ্তকরণে উৎসাহিত করতে এবং কর্মোপযোগী তরুণ ও বয়স্ক শ্রমশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ।
- বেকার দরিদ্রদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। সরকার খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করা হবে।
- জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেকারত্ব, অসুস্থতা, মাতৃত্ব ও দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।
- ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুস্থ, একাকী মাতা ও কিশোরী বালিকাসহ বেকার একাকী নারী) জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা। মহিলারা বয়স্ক ভাতা পাবেন এবং যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবেন। অধিকন্তু, ঝুঁকিগ্রস্ত কর্মোপযোগী নারীরা কোনো বিশেষ জটিলতা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদেরকে দুঃস্থ নারী সুবিধা কর্মসূচির অধীনে আয় অনুদান সুবিধা প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ এবং শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণে সহায়তা করতে বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা : এই সংস্কারমূলক কর্মসূচির চারটি অংশ রয়েছে :

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ষাটোর্ধ্ব বয়সী জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা। অর্থ বিভাগের আওতাধীন সরকারি পেনশনে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন করা হবে না, আগের মতোই তা অব্যাহত থাকবে।
- জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এটি ২০১০ সালের বিমা আইনের অধীনে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে। মালিক ও কর্মী উভয় পক্ষের অবদানের উপর ভিত্তি করে বিমা তহবিল গঠিত হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি পেনশন ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা (প্রতিবন্ধী, অসুস্থতা, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব) ভাতা প্রদান করবে।
- বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছাধীন পেনশন কর্মসূচি চালুর উপায়সমূহ পর্যালোচন করা হবে। পেশা ও কর্মসংস্থান নির্বিশেষে তা সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- বয়স্ক ভাতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কর্মসূচির অর্থায়ন বাজেট থেকে করা হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি ও 'বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী পেনশন' স্কিমে অর্থায়ন করা হবে নিয়োগকর্তা ও কর্মী উভয় কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা থেকে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি : প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি থাকবে :

- শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা।
- কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা।

ভাতার প্রকৃত মূল্য অক্ষুণ্ন রাখা : ভাতার প্রকৃত মূল্য যাতে কমে না যায় সেজন্য জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে

প্রদত্ত সকল নগদ ভাতা, মুদ্রাস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করা হবে। পঞ্চম অধ্যায়ে যে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে এটি বাস্তবায়নে কোনো অর্থায়ন সমস্যা হবে না।

আয়-যোগ্যতার মানদণ্ড : উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী হিসাবে সেসব দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষেরা নির্বাচিত হবে যারা প্রতিটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির অন্যান্য শর্তাদি পূরণ করবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রক্সি মিনস টেস্টের উপর ভিত্তি করে আয়-যোগ্যতা নির্ধারিত হবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে হবে।

স্বাস্থ্য বিমা ও মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড : সরকার অবগত আছে যে স্বাস্থ্য খাতের অর্থায়নের সংস্কার ছাড়া এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইত্যাদির সেবা সরবরাহে হস্তক্ষেপ ছাড়া জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রদত্ত নগদ ভাতা প্রদান এককভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। সরকার ইতোমধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপকভিত্তিক স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল গ্রহণ করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। অধিকন্তু, স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি জোরদারকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি : মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলো একীভূত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কর্মসূচির অধীনে অব্যাহত থাকবে।

ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহকে সংহতকরণ : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্র কর্মসূচির সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা মোকাবেলায় পাইলট ভিত্তিতে নতুন পন্থা চালুর নিমিত্তে এসব কর্মসূচির বেশিরভাগই উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় গৃহীত হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল কর্মসূচিসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি উদ্ভাবনীমূলক ধারণা, উন্নীতকরণ এবং কর্মসূচির একীভূতকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। এসকল কর্মসূচি কী মাত্রা যোগ করবে অর্থাৎ এগুলো থেকে কী সুবিধা পাওয়া যাবে বা কী ফলাফল অর্জিত হবে ইত্যাদি নিরূপণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের নেতৃত্বে এসব প্রতিটি ক্ষুদ্র কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী বা পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রণালয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন কর্মসূচি অব্যাহত রাখা উচিত কিনা সে বিষয়ে একটি বিজনেস কেইস প্রস্তুত করবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিজনেস কেইসের ভিত্তিতে কোন কোন কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিৎ বা উচিৎ নয় সে বিষয়ে জিইডির নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন মন্ত্রিপরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করবে।

খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহকে সংহতকরণ : দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তীকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজন হলে ক্ষুধা ও খাদ্য প্রাপ্তি ইস্যু মোকাবেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন খোলা বাজারে বিক্রয়ের (ওএমএস) পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ওএমএস বর্তমানের মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্য-ভিত্তিক হিসেবেই চালু থাকবে। ওএমএসের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ এবং দুর্যোগকালীণ ত্রাণ হিসেবে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সরকারের খাদ্য মজুদ নীতি ও ন্যায্যমূল্য নীতির সাথে সমন্বিত করা হবে। গভীর পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে সরকার সকল কর্ম-সৃজনমূলক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিগুলোকে নগদ অর্থ হস্তান্তরমূলক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ অবনয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস করা : সরকারের ব্যাপকতর উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহকে আরও জোরদার করা হবে। কৃষি গবেষণা, বাঁধ ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মাত্রা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি যেমন, পরিকল্পিত বদ্বীপ (ডেল্টা) এলাকা উন্নয়ন এক্ষেত্রে আরও বেশি উপকারে আসবে।

নগর এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো : সরকার নগর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অধিক হারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ। যেহেতু বয়স্ক, শিশু, দুস্থ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বিস্তৃত হচ্ছে, সেহেতু এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে অন্য সবার ন্যায় নগরের বাসিন্দাদেরও এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার আরও অনুধাবন করেছে যে, আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের অবস্থানগত কারণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নতুন প্রস্তাবসমূহ, যেমন: শিশু পরিচর্যা ও জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম, প্রাথমিকভাবে নগর এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক উপকার সাধন করবে। সুতরাং গ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছে এসব সুবিধা সম্প্রসারিত করতেও বিশেষ প্রচেষ্টা প্রদান করা হবে।

সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো : সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জেন্ডার, ধর্ম, জাতি, পেশা বা অসুস্থতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়।

সরকার আইনি ও অন্যান্য ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার বিলোপ সাধনে অত্যন্ত সজাগ। এটি সরকারের ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর একটি বড় এজেন্ডা। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, অন্য সবার ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীরও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির পাশপাশি সরকার প্রদত্ত সকল মৌলিক সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) প্রাপ্তির সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এসব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তাকরণে দুস্তর বিশিষ্ট সরকারি নীতি হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়।

এসব জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যের কাছে পৌঁছাতে যে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে সে বিষয়েও সরকার যথেষ্ট সজাগ। এক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মীদের সংবেদনশীল করার পাশাপাশি সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের ওপর নির্ভর করা। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূলধারায় নিয়ে আসতে একটি কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রয়োজন।

ছ. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন হবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের যৌথ অংশীদারিত্বে। অর্থাৎ এর একটি অংশের অর্থায়ন করবে সরকার আর অন্য অংশটির অর্থায়ন করবে সামাজিক বিমা ও কর্মসংস্থানভিত্তিক আইন অনুযায়ী বেসরকারি খাত। তবে নীতিসংক্রান্ত একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো সীমিত সম্পদের বিবেচনায় সরকারের অংশটি ব্যয়সাধ্য কিনা। অর্থায়নের ধারণাটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থকে জিডিপির শতকরা হার হিসেবে (জিডিপির ২.২ শতাংশ) স্থির ধরে নিরূপণ করা হয়েছে। দুটি কারণে এটিকে রক্ষণশীল অনুমিতি বলা যায়, প্রথমত: সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে (২০১৪-১৫ অর্থ বছরে) সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয় জিডিপির ২.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। দ্বিতীয়ত: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হালনাগাদকৃত মধ্যমেয়াদি কাঠামো থেকে দেখা যায় যে চলমান কর সংস্কারের অগ্রগতির ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকার তার সম্পদের স্থিতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি বছর অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় জিডিপির ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

ভিত্তি-কেইস অর্থায়নে অনুমিতি করা হয়েছে যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বর্তমানের ন্যায় বছরে গড়ে কমপক্ষে ৬ শতাংশ হারে হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যখন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে তখন আয় যোগ্যতার মানদণ্ড ও অন্যান্য যোগ্যতার মানদণ্ড প্রয়োগ করে বিভিন্ন জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচি থেকে মোট ৩৫.৭ মিলিয়ন দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। এ সুবিধাভোগীর সংখ্যা হবে তখনকার মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। ভিত্তি কেইসের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনীয় সম্পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এ প্রাক্কলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সম্পদ আহরণ ও প্রাপ্তি কোনো বড় বাধা হবে না।

নিম্নোক্ত কারণে সুখকর ফলাফল পাওয়া যাবে :

- প্রথমত, এমনকি রক্ষণশীল অর্থায়ন অনুমিতির অধীনেও সামাজিক নিরাপত্তা সংস্কার কর্মসূচি অর্থায়নযোগ্য। প্রথম কয়েক বছর যে সামান্য ঘাটতি দেখা দেবে তা ক্রমবর্ধমান বাজেট থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে পূরণ করা যাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অতিরিক্ত সুবিধার বেশ বড় একটি অংশ দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর শিশুদের কাছে পৌঁছাবে, যা সরকারের উচ্চ অগ্রাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

- দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল জনমিতি এবং ক্রমহ্রাসমান তরুণ প্রজন্মের জনসংখ্যার অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

- তৃতীয়ত, কৌশলটি জীবনচক্র ব্যতীত স্বতন্ত্র কর্মসূচিগুলোর জন্যও পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা রেখেছে যার কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।

- সবশেষে, কর্মসূচিতে প্রদত্ত সুবিধায় কোনো ধরনের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের পর বিপুল উদ্বৃত্ত গড়ে উঠবে। এ উদ্বৃত্ত বার্ষিক ৭-৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে চিত্র অনুমান করা হয়েছে তার অধীনে অনেক বড় আকারের হবে। এটি দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা চাহিদা পূরণ করতে জীবনচক্র ও অন্যান্য কর্মসূচির সম্ভাব্য আকার বৃদ্ধির জন্য সুবিধাভোগী পর্যায়ে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা পুনঃপরীক্ষা করতে সরকারকে সহায়তা করবে। এছাড়াও, সরকার যেমন অতি দরিদ্র ও টার্গেটকৃত জনগোষ্ঠীর জন্য (তরুণ সম্প্রদায়) কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে তেমনি নতুনতত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপরে পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব : প্রাক্কলিত ফলাফল থেকে দেখা গেছে, যখন বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের সাথে তুলনা করা হবে তখন পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহ থেকে অধিকতর ভালো দারিদ্র্য হ্রাস ফলাফল অর্জিত হবে। অধিকতর কার্যকর ফলাফল অর্জনের কারণ হলো আরো ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত এবং উচ্চতর গড় সুবিধা সৃষ্টিকারী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে অধিক সংখ্যক দরিদ্র পরিবার সরাসরি উপকার লাভ করবে।

জ. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবাপ্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

সরকার উপলব্ধি করেছে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সফলতার জন্য কর্মসূচি পরিচালন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যা ও দুর্বল গভর্নেন্স পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উত্তম প্রাতিষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে অপচয় কমবে। অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে এমন একাধিক ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করে এমন একটি সহজবোধ্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্বপূর্ণ মনোভাব জাগ্রতকরণ যাতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সেবাপ্রদানে একদল দক্ষ কর্মীর ব্যবস্থা থাকে।
- দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ।
- ব্যবস্থাপনা তথ্য ভাণ্ডারের মান উন্নয়ন করা যেন এগুলো সরকারি সমন্বয় এবং কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণে দক্ষভাবে সহায়ক হয়।
- অপচয় কমাতে এবং বিশেষ করে দরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে ভাতা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
- কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ থাকার পাশাপাশি প্রতিশ্রুত সুবিধা বিতরণে কোনো ব্যর্থতা বা ত্রুটি এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার গোচরীভূত হলে সে বিষয়ে জনগণ যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করার সুযোগ পায়।

প্রশাসনিক সংস্কার : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে; ৫টি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার হচ্ছে : সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা, সামাজিক বিমা, শ্রম/জীবিকায়ন, মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিওদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিত-করণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এনজিওদের ভূমিকা : জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনে এ অংশীদারিত্বকে আরও গভীরভাবে বিস্তৃত করবে। যেসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ সহায়ক হতে পারে সেগুলো হলো ভবিষ্যতে বিস্তৃতির সম্ভাবনা রয়েছে এমন উদ্ভাবনীমূলক পাইলট কর্মসূচি সৃজন, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী অথবা প্রান্তিক বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেসকল মানুষের নিকট সেবা পৌঁছানো কঠিন তাদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা।

একক রেজিস্ট্রি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দক্ষ পরিচালনার জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন ও আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) অপরিহার্য। অনেক উন্নয়নশীল দেশের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর এমআইএস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বস্তুত, স্বাধীন তবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচিভিত্তিক এমআইএস এর নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে এক ধরনের জাতীয় একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সুতরাং, একে অপরের সাথে যুক্ত হতে এবং সরকারকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে পারে এমন কর্মসূচিভিত্তিক পরিবীক্ষণ তথ্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য ব্যবহার করবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদান করবে। জাতীয় সংস্কার প্রক্রিয়ার সহায়তাকল্পে বাংলাদেশ খানা তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুতির কাজ ২০১৭ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে সরকার থেকে সুবিধাভোগী (জি২পি) পেমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালীকরণ : জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটে এবং অপচয় হ্রাস পায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করার নিমিত্ত সরকার বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ অর্থ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং, এ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ বিদ্যমান জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার উপর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা সম্পাদন করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ : মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসূচিসমূহের সহায়তা সঠিক ব্যক্তির কাছে যেন পৌঁছে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে, বিশেষ করে দারিদ্র্যভিত্তিক বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অভিন্ন সমস্যা। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পিএমটি স্কোরকার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশ খানা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ২০১৭ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে। পিএমটি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করতে পিএমটি ছাড়াও স্থানীয় সরকার এবং এনজিওদের সহায়তা নেয়া হবে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, পিএমটি স্কোরকার্ড নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এনজিওসহ স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্তির পরই ব্যবহার করতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল এমন অনেক দেশেই প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ বেশ জটিল, তবে সর্বাধিক যোগ্যরাই প্রতিবন্ধী সুবিধা পাবে তা নিশ্চিত করতে সরকার পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা : সরকার উপলব্ধি করেছে যে, উপকারভোগীদের বিষয়ে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে পরামর্শ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। বাছাই প্রক্রিয়ার সমান্তরালে অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তির বিষয়েও একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে এবং এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন ২০১৬ সালে শুরু হবে।

ঝ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেলে সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ফলাফল নথিবদ্ধকরণ, বিকল্প উপায়সমূহের কার্যকারিতা বিষয়ে নীতিনির্ধারকদেরকে অবহিতকরণ, এবং কর্মসূচির ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন সংগঠিতকরণে একটি চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের সমন্বয়মূলক ভূমিকা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম তিনটি অংশে বিভক্ত হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজেদের কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে; প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। শেষত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) দায়িত্ব হবে সুনির্দিষ্ট সূচকের ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে একটি ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা এবং সে আলোকে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা। এছাড়া, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর সার্বিক সমন্বয় এবং মূল্যায়ন ফলাফল অবহিতকরণের দায়িত্বও জিইডির উপর ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করবে। বস্তুত, সিএমসির দায়িত্ব হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন, সমস্য সমাধান এবং সংকট প্রশমন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফল অবহিতকরণ ও প্রয়োগ: সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যবহৃত সম্পদ থেকে যেন সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফল অবহিতকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সকল স্টেকহোল্ডার যেমন: সুবিধাভোগী, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের নিকট থাকা দরকার। কর্মসূচির উপকারভোগীদেরকে কর্মসূচির অর্জন বিষয়ে এবং যোগ্যতার মানদণ্ড বিষয়ে অবগত থাকতে হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে সকল ধরনের পরিবীক্ষণ তথ্য ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংরক্ষণের মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে। সকল মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হবে। জিইডির দায়িত্ব হবে মন্ত্রিপরিষদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা এবং পরবর্তীতে জিইডি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফলের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয়সাধন: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল আগামী দিনগুলোতে বেশ সময় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরো সংস্কারের দাবী রাখে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্কার কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা করবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে এ কমিটি নিয়মিতভাবে মন্ত্রিসভায় প্রতিবেদন দাখিল করবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত সংস্কার	কর্মপরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ক. কর্মসূচি সংস্কার		
১. শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ (বয়স<১-১৮) -শিশু সহায়তা -প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তি -এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং বিদ্যালয় খাদ্য কর্মসূচি অব্যাহত রাখা -পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য শিশু লালন-পালন ব্যয় নিশ্চিতকরণ -টীকাদান, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ	-শিশু সহায়তা কর্মসূচির বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -বৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা -চলমান কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখা -নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা, জুলাই ২০১৬ -চলমান কর্মসূচিসমূহের সরবরাহ ও সুবিধাভোগীদের নিকট সেবা পৌছানো জোরদারকরণে পদক্ষেপ নেয়া	- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
২.ক কর্মোপযোগীদের (১৯-৫৯ বছর) জন্য কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ -শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ -কর্মসৃজন কর্মসূচিসমূহ জোরদারকরণ -জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিমের আওতায় বেকার, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ও মাতৃত্ব বিমা প্রবর্তন করা	- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নতকরণ -সকল কর্মসৃজন কর্মসূচি সংহত করা -সংগঠিত বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য বেকারত্ব বিমা চালুর নিমিত্তে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ -পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা ও বাস্তবায়ন শুরু করা	-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয় -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ -শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.খ দুস্থ মহিলাদের জন্য কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ (১৯-৫৯ বছর) -নারীদের জন্য সকল নগদ ভাতা ভিত্তিক কর্মসূচিকে দুস্থ নারী ভাতা কর্মসূচিতে একীভূত করা -সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকা -মাতৃস্বাস্থ্য সেবা -প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	-দুস্থ নারী ভাতার জন্য বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা -সকল সরকারি অফিসে ও সংগঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকবে -সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি করা -ভিজিডির অধীনে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা	- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা -বয়স্ক ভাতা (ষাটোর্ধ্ব) -সরকারি কর্মচারীদের পেনশন -জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি (এনএসআইএস) -বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন	-বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা -এনএসআইএস -এর প্রয়োগযোগ্যতা নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ -এনএসআইএস এর জন্য বিকল্প সুপারিশ করা -পেনশন রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের প্রয়োগসাধ্যতা নিরূপণে সমীক্ষা শুরু করা	- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি), অর্থ বিভাগ

প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত সংস্কার	কর্মপরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	- শিশু পোষ্য ভাতা সুবিধা (চাইল্ড ডিপেনডেন্সী বেনিফিট) ও কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন	- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. শহুরে দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	- গ্রাম এলাকার দরিদ্রদের ন্যায় নগর এলাকার দরিদ্র খানাগুলির জন্যও কর্মসূচির সুবিধালাভের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা	- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এলজিডি, অর্থ বিভাগ
৬. খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে একীভূতকরণ ও সংস্কার সাধন	- খাদ্য মজুদকরণ নীতির সাথে সমন্বয় করে খাদ্য হস্তান্তরমূলক কর্মসূচিসমূহকে সংহত করা; -দুর্যোগ ত্রাণ কর্মসূচি হিসেবে দুর্যোগ ত্রাণের জন্য খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রাখা	- খাদ্য/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৭. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহকে একীভূতকরণ	- উদ্ভাবনীমূলক এবং উন্নীত করা যায় এমন কর্মসূচিসমূহকে অব্যাহত রাখা	- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ/জিইডি
খ. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার		
১. দুটি পর্যায়ে সংস্কার (১) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলির ক্লাস্টার সমন্বয় পদ্ধতিতে সিএমসি নেতৃত্ব দেবে (২০২৫) পর্যন্ত (২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং এসএসপি সমূহের সমন্বয়সাধন করবে	- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ক্লাস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করা - ক্লাস্টার পদ্ধতির দক্ষতা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা এবং কর্মসূচিসমূহের সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে সিএমসি (২০২৫ সাল পর্যন্ত) - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার সাধন (২০২৬ থেকে)	- মন্ত্রিসভা - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - জিইডি - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ
২. একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা	- সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের এমআইএস পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা - পাইলট ভিত্তিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর অধীনে একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা - দেশব্যাপী একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা	- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩. আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটাতে সরাসরি সরকার থেকে সুবিধাভোগী পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদারকরণ	- বর্তমান জি২পি ব্যবস্থার ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেয়া - পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন শুরু করা	-অথ বিভার্গ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ -বাংলাদেশ ব্যাংক -অর্থ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়
৪. সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ	- সকল কর্মসূচির বাছাই মানদণ্ড পর্যালোচনা করা - সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের ব্যবহার করে পিএমটি পদ্ধতিতে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ	- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ - জিইডি - আইএমইডি - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ
৫. অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	- অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমীক্ষা পরিচালনা করা - বাস্তবায়ন শুরু করা	- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - জিইডি - এলজিডি
৬. ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব নির্ধারণ করা - পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করতে টাস্কফোর্স গঠন - টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়ন	- মন্ত্রিপরিষদ - জিইডি - জিইডি, আইএমইডি

অধ্যায়-১

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের পটভূমি

অধ্যায় ১
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের পটভূমি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) দলিলে। এ প্রতিশ্রুতির অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত বিগত অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগণ যে ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে তার প্রভাব কমানোর মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাও এর লক্ষ্যভুক্ত। এটি অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের অতীত সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও জনগণের এক বিরাট অংশ নানাবিধ কারণে এখনো দারিদ্র্যঝুঁকিতে রয়ে গেছে যাদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্র্যসীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষজন। দেখা গেছে, দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না। বর্ণিত কারণে দরিদ্র ও দারিদ্র্য সীমা নিকটবর্তী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য প্রতিবন্ধক বিভিন্ন ঝুঁকি ও অভিঘাতসমূহ মোকাবেলায় বাংলাদেশে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সময়ের সাথে বেড়েছে। কিন্তু তথ্য প্রমাণে এটাও দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনো এসব কর্মসূচির আওতায় আসেনি। এছাড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রাপ্ত গড় সুবিধার পরিমাণ খুবই কম এবং এর প্রকৃতমূল্যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের যে প্রভাব থাকে সে তুলনায় এসব কর্মসুচিতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব অনেক কম।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিসমূহের প্রভাব কম হওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উদ্ভব হয়েছে কিছুটা এডহকভিত্তিতে মূলত বিশেষ বিশেষ সময়ের বহিস্থ অভিঘাত (যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনের জন্য। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদানে দাতাগোষ্ঠীর উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিতে গিয়েও বেশ কিছু কর্মসূচির আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে এসব কর্মসূচি সংখ্যার বিবেচনায় অসংখ্য, প্রায়শই দ্বৈততাযুক্ত, একক কর্মসূচি ভিত্তিক, স্বল্প বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত এবং একাধিক সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন। এছাড়া এসব কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল এবং এগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপের প্রধান সূচক হচ্ছে অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ, অর্জিত ফলাফল নয়।

প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর জন্ম হয়েছে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজনে। ফলে এগুলো কোনো কৌশলগত পরিকাঠামোর (যেমন, আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত জীবনচক্র ভিত্তিক কাঠামো) সঙ্গে সুসমন্বিত নয়। জনমিতিক পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে যেসব চাহিদা বা প্রয়োজনের উদ্ভব হতে পারে সেগুলোও বিবেচনায় নেয়া হয়নি এসব কর্মসূচির নকশাতে। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে নগরভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও আধুনিক সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের উত্তরণের সাথে সাথে দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষজন যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। জনমিতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বর্তমান বিন্যাসে অনেক গুরুতর ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কৌশলের ব্যাপকতর সম্প্রসারণের প্রয়োজন। প্রয়োজন একে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ধারণায় রূপান্তরিত করা যা শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে ও সামাজিক বিমা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিতে সুফলভোগীদের সহায়তা করবে। জীবনচক্র কাঠামোর পটভূমিকায় সামাজিক নিরাপত্তা রূপকল্প আধুনিক নগরভিত্তিক অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে খাপ খায়।

এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে (জিইডি) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) তত্ত্বাবধানে জিইডি এ কৌশল প্রণয়ন করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৌশল প্রণয়নের কর্মপরিধি নির্ধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও এই পরিচালনা কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। এই কৌশলের বিষয়বস্তু ও সুপারিশমালা রচনায় সহায়তাকল্পে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মশালা, আলোচনা-সভা ও সংলাপ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় প্রণীত সম্পূর্ণভাবে একটি দেশজ কৌশল।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোর পরিমার্জন ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে আরো নিখুঁত, দক্ষ, ও কার্যকর করে তোলা এবং ব্যয়িত অর্থ থেকে সবার্ধিক সুবিধা অর্জন। এটি সনাতনী ধারণার পরিবর্তে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাবে। এ নতুন ব্যবস্থা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের (যখন অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে ৫ শতাংশের চেয়ে কম) বাস্তবতায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আওতা ও পরিধির বিস্তৃতির মাধ্যমে এবং কর্মসূচির নকশা ও আদলের উন্নয়ন ঘটিয়ে এ কৌশল একদিকে আয় বৈষম্য কমাতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে ভূমিকা রাখবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে।

সামাজিক নিরাপত্তার এই জাতীয় কৌশলটি কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত করেনি, বরং অধিগ্রহণ করেছে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তলব্ধ জ্ঞান ও ধারণাকেও। কৌশল প্রণয়নে সহায়তাকল্পে জিইডি একটি কাঠামোপত্র (ফ্রেমওয়ার্ক পেপার) তৈরি করে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির আওতায় গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ১০টি পটভূমিপত্র (ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার) রচনার উদ্যোগ গৃহীত হয়। পটভূমিপত্রসমূহের তালিকা সংযুক্তি-০১ এ প্রদান করা হলো। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এসব পটভূমিপত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এসব পটভূমিপত্রে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে।

১.২ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারের যেসব নীতি ও কর্মসূচি সম্মিলিতভাবে একটি বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) গঠন করে সামাজিক নিরাপত্তা নীতিকে সেসব নীতি ও কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা যা বাংলাদেশকে এর উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অনেকগুলি নীতি ও কর্মসূচি ও সেগুলির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এসব নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, শিক্ষা কৌশল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশল, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার কৌশল, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল। এসব কর্মসূচি ও কৌশল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং এগুলো দারিদ্র্যহ্রাসের উপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে, দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমায় এবং দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়নের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা নীতির সুস্পষ্ট সম্পর্ক থাকলেও এটি ব্যাপকভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন ও মানব উন্নয়ন কৌশলের বিকল্প নয়। একইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির মাত্রা কমানোর একটি প্রধান হাতিয়ার হলেও এটি একমাত্র উপায় নয়। কর্মবঞ্চিত ও সমাজবহির্ভূত হয়ে সমাজের যেসব মানুষ বৈষম্যের শিকার ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তাদের জন্য সরকারের বেশকিছু সংশোধনমূলক ও ইতিবাচক নীতিমালা রয়েছে যা সমাজে সংহতি আনয়ন করবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের আরেকটি দিক হলো ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘন ঘন সংঘটন। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক ব্যবস্থাপনা সরকারের সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর অন্যতম অগ্রাধিকার। উন্নত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের প্রভাব, বিশেষত জীবনহানি ও জখমের হার হ্রাসকরণে বাংলাদেশ ব্যাপক ও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তবে ঝুঁকির পরিমাণ এখনও উল্লেখযোগ্য। সরকার তার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রতিনিয়ত পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপর্যুক্ত পটভূমিতে, বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নীতি ও কর্মসূচিগুলোর কৌশলগত পর্যালোচনা ও সংস্কার সাধনের উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা। এই কৌশলকে অবশ্য সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর সাথে এক করে দেখা চলবে না। উক্ত কাঠামোর আওতা ও পরিসর আরো

ব্যাপক। এ কৌশলটিকে দেখতে হবে সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর আওতাভুক্ত সামাজিক উন্নয়ন কৌশল ও নীতিসমূহের পরিপূরক হিসেবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অগ্রাধিকার ও আওতার বিষয়ে বিভ্রান্তি নিরসনে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচির সাথে অধিক্রমণ (ওভারল্যাপ) ও দ্বৈততা (ডুপ্লিকেশন) পরিহার করতে কী করা উচিত ও কী উচিত নয় তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে একটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রয়োজন হবে।

১.৩ দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

মাথাগুণতি অনুপাতে পরিমাপকৃত দারিদ্র্যহ্রাসের গতিধারা চিত্র ১.১ এ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার শতকরা হার বেশ দ্রুত গতিতে কমেছে। দারিদ্র্যহার ২০০০ সালের ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ ও ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ হয়েছে। এই ধারায় ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ হতে ২০১৫ সালে দারিদ্র্যহার নেমে এসেছে ২৪.৮ শতাংশে। একইভাবে নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ২০০০ সালের ৩৪.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৭.৬-এ দাঁড়িয়েছে। এ হার আরও কমে গিয়ে ২০১৫ সালে হয়েছে ১২.৯ শতাংশ।[২]

চিত্র ১.১: দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা ২০০০-২০১০

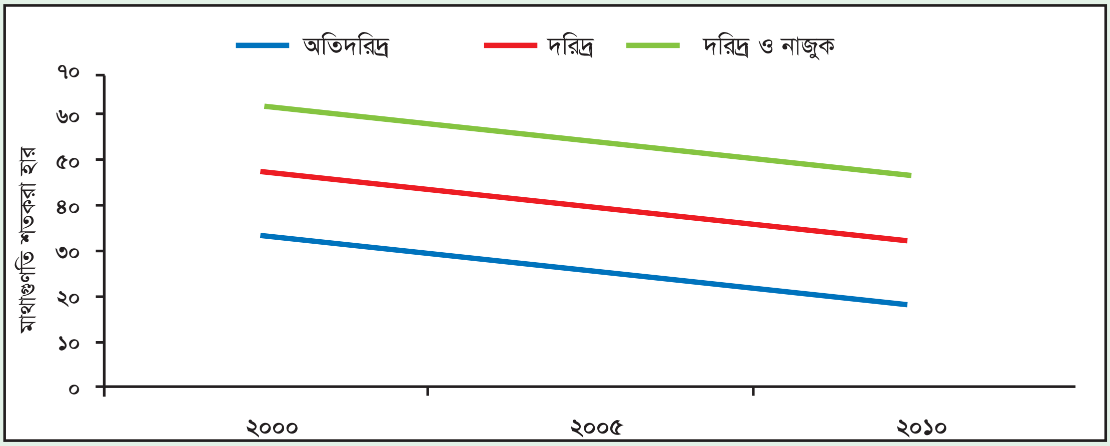

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০১০।

চিত্র ১.২: দারিদ্র্য গভীরতা ও ভোগ ব্যবধান (শতাংশ)

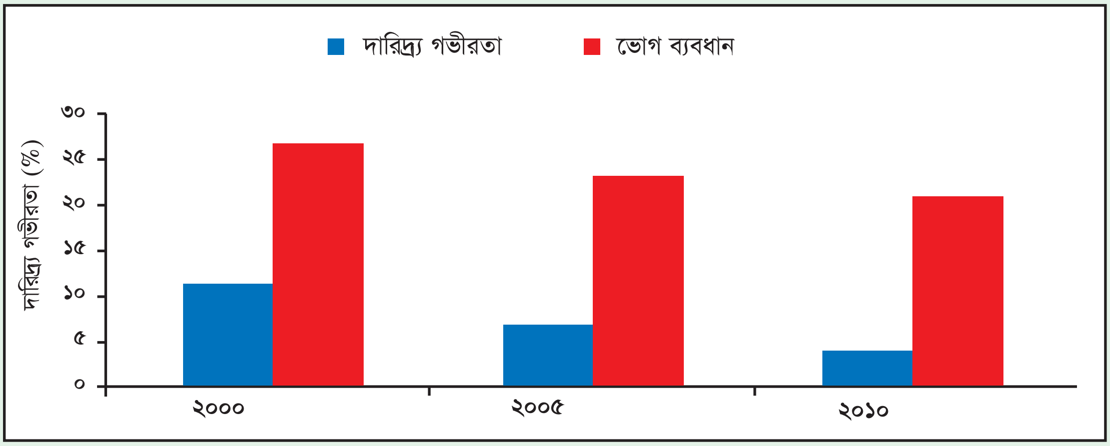

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০১০।

দারিদ্র্য গভীরতা হ্রাসের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি প্রচলিত পরিমাপ হলো ভোগ ব্যবধান, অর্থাৎ দরিদ্র জনগণের গড় ভোগের পরিমাণ দারিদ্র্যরেখার তুলনায় কতটা কম তা বিবেচনা করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করতে যে অতিরিক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন এসব নির্দেশক তারই ইঙ্গিতবাহী। চিত্র-১.২ এ দারিদ্র্য গভীরতা ও ভোগ ব্যবধান (দারিদ্র্য গভীরতা ও মোট মাথাপিছু দারিদ্র্য হারের অনুপাত দ্বারা পরিমাপকৃত) দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০ ও ২০১০ সালের মধ্যে ভোগব্যবধান অব্যাহতভাবে হ্রাস পেয়েছে।

[২] খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৫-র উপাত্ত না থাকার কারনে জিইডি অনুমান করছে যে ২০১৫ সালে দারিদ্র্য হার শতকরা ২৪.৮ ভাগ কমেছে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা ১২.৯ ভাগ কমেছে।

২০০০ সালে দরিদ্র জনগণ গড়ে দারিদ্র্যরেখা দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে ২৬ শতাংশ কম হারে ভোগ করেছে। এ ব্যবধান কমে গিয়ে ২০০৫ সালে ২৩ শতাংশ ও ২০১০ সালে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৫ সালের জন্য প্রাক্কলিত পরিমাপ হলো ১৯ শতাংশ।[৩]

গ্রাম-শহর ভেদে দারিদ্র্য-বিন্যাস চিত্র-১.৩ এ দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই দারিদ্র্য হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হার তুলনামূলকভাবে এখনও অনেক বেশি।

চিত্র ১.৩: দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রগতি - গ্রাম বনাম শহর

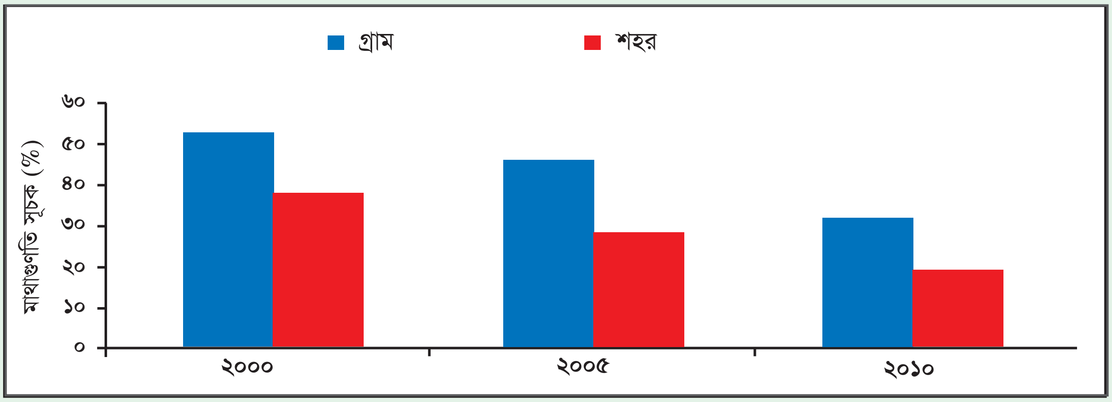

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০১০।

অঞ্চলভেদেও দারিদ্র্য বিন্যাস চিত্র একইভাবে ক্রমহ্রাসমান। দেশের ছয়টি বিভাগে দারিদ্র্যহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে (চিত্র ১.৪)। অবশ্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দারিদ্র্যহারের ব্যবধান এখনও ব্যাপক। রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যহার সর্বোচ্চ (৩৯.৪ শতাংশ), যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক উপরে (৩১.৫ শতাংশ)। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যহার সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে (২৬.২ শতাংশ), যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম। যেখানে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে দারিদ্র্যহার জাতীয় হারের চেয়ে বেশি, সেখানে সিলেট ও ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্যহার জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে কম।

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ থেকে আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল বের হয়ে এসেছে আর তা হলো নবগঠিত রংপুর বিভাগ ও পুনর্গঠিত রাজশাহী বিভাগের (রংপুর বিভাগের অধীন জেলাগুলি বাদে) মধ্যে দারিদ্র্যের বিভাজন বা বণ্টন। উল্লেখ্য, পুনর্গঠিত রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যহার (২৯.৭ শতাংশ) কেবল জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যহারের চেয়ে কম নয় ঢাকা বিভাগের চাইতেও কম। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যহার সবচেয়ে বেশি রংপুর বিভাগে (৪২.৩ শতাংশ), যা রংপুর বিভাগকে দেশের ৭টি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

চিত্র ১.৪: বিভাগ ওয়ারি দারিদ্র্য প্রবণতা

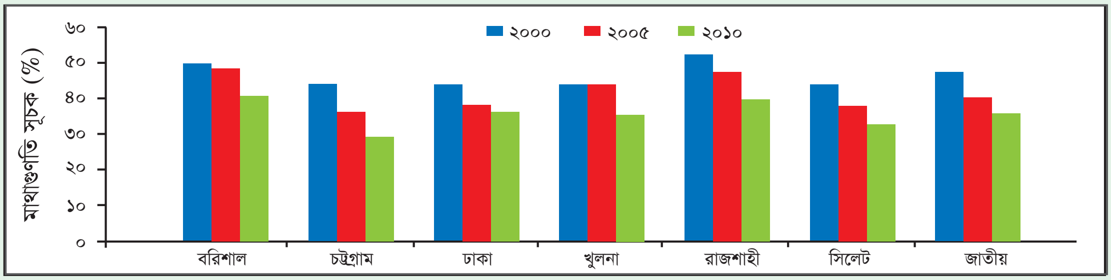

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০১০।

[৩] আদর্শ ভোগ ব্যয় ব্যবধান পরিমাপের জন্য প্রত্যেক খানার ভোগ ব্যয় উপাত্ত প্রয়োজন। ২০১৫ সালের কোন খানা জরিপ করা হয় নাই যা থেকে ভোগ ব্যয় ব্যবধান পরিমাপ করা যাবে। ২০১৫ সালের খানা জরিপ অনুপস্থিতির কারনে ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ এর দারিদ্র্য পরিমাপের উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন, মানব উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার উন্নয়ন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতির চিত্রগুলি বাংলাদেশকে জাতি হিসেবে গর্বিত করেছে। চিত্রগুলি আরও নিশ্চিত করে যে উন্নয়ন কৌশলসমূহ যথাযথ ও সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ ব্যাপক ও বহুবিধ হবে। এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট এসব চ্যালেঞ্জের রয়েছে নানা দিক ও মাত্রা ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল প্রণয়নে এগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পর্যাপ্ততা যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

অঞ্চলভেদে (গ্রাম ও শহর এবং বিভাগ অনুসারে) দারিদ্র্যের বণ্টনে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দারিদ্র্য বণ্টনের এই ভৌগোলিক পার্থক্য দারিদ্র্য চিত্রায়নের বর্তমান পদ্ধতির আরো পরিশোধন, পরিমার্জন ও প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। বর্তমান পদ্ধতিকে নিখুঁত করার জন্য আরও মানদণ্ড (প্যারামিটার) যেমন, জেন্ডার, বয়স, শিক্ষা, সম্পদ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি সংযোজনের গুরুত্বও এটি তুলে ধরে। এর ফলে একটি যথাযথ দারিদ্র্য নিরসন কৌশল (ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড) প্রণয়ন সম্ভব হবে। তাৎপর্যের বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলকে দারিদ্র্যচিত্র এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। অর্থনীতি ও সমাজের ব্যাপক রূপান্তরের কারণে নাজুক বা ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সেবা-পরিচর্যার প্রচলিত ধরন এখন আর পূর্বের ন্যায় কার্যকর নয়। জনমিতিক পরিবর্তন এবং নগরায়ন ও অভিবাসন ইত্যাদি অনুঘটকের কারণে সকল দেশেই এ রকম ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু উন্নয়নের সাথে সাথে সব দেশেই এরকম পরিবর্তন ঘটছে, সেহেতু এটি অপরিহার্য যে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সেসব উপায় বা পদ্ধতির ব্যবস্থা করবে যেগুলির দ্বারা সরকার সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদেরকে তাদের সামাজিক বলয়ে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। এছাড়া এটি সমাজে তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানও প্রদান করে থাকে।

১.৪ বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এসব নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অংশত বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাতের কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় এককালীন ভাতা পেতেন। যাহোক, ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকাণ্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলি জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলিতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠীও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সামাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও ছিল সামাজিক অনুদানমূলক (সোশ্যাল ট্রান্সফার) কর্মকাণ্ড।

ক্রমান্বয়ে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্যসহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান যুক্ত হয়েছে।

এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সারণি-১.১ এ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে সাধিত উদ্ভাবনীসমূহের চাহিদাতাড়িত প্রক্রিয়ার একটি সময়চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি ১.১: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত উদ্ভাবনীসমূহ –একটি সময়চিত্র

সময়কাল	উদ্ভাবনীসমূহ	প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ
সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত	ভিজিএফ বর্ধিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ক্ষুদ্রঋণ	১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকটের প্রতিক্রিয়া
মধ্য আশির দশক	'ত্রাণ' থেকে 'ত্রাণ ও উন্নয়ন' এর উপর গুরুত্ব দেওয়ায় ভিজিএফ কর্মসূচি ভিজিডিতে রূপান্তরিত হয় (পরে আইজিভিজিডি-তে)	তীব্র ক্ষুধা কমাতে কেবল খাদ্যের সংস্থানই যথেষ্ট নয়-সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে সমালোচনা করা হয় যে এ ধরনের উদ্যোগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে ফেলছে। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে এ ধরনের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত এবং এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
আশির দশকের শেষ প্রান্ত	**আরএমপি: কর্মসৃজনমূলক উদ্ভাবনী কর্মসূচি** -সুরক্ষার সাথে উন্নয়ন লক্ষ্যও যুক্ত হয় -মাটি কাটার কাজ ছাড়াও সামাজিক বনায়ন, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার ইত্যাদি যুক্ত হয়	১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে উপর্যুপরি সংঘটিত ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়ায় মৌসুমভিত্তিক মৃত্তিকানির্ভর অবকাঠামোর পরিবর্তে সকল মৌসুম উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ পরিলক্ষিত হয়।
নব্বই দশকের প্রথম ভাগ	**শর্তযুক্ত নগদ অর্থসহায়তা** শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের দুটি উপাদান হলো: ১) নব্বই দশকে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ফলে দেখা গেল, নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে নবতর উৎসের সন্ধানে রত; এবং ২) পল্লী রেশনিং কর্মসূচি বিলুপ্তির প্রেক্ষিতে খাদ্য-সহায়তার নবতর ব্যবহারের উপায় অনুসন্ধান।
নব্বই দশকের শেষ ভাগ	**ভিজিএফ কার্ড** বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা	১৯৯৮ সালে সংঘটিত ধ্বসাংত্মক বন্যার প্রতি সাড়াদানের ফল হলো ভিজিএফ কার্ড প্রবর্তন। তখন খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্রুততম সংস্থান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ দুটি কর্মসূচি হলো প্রতিযোগিতাপূর্ণ জনপ্রিয়তানির্ভর রাজনীতি তাড়িত উদ্ভাবনী ।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথম ভাগ	**উত্তরণ অভীষ্ট** সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসহ আরএমপি ও ভিজিডির ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ	কেবল সুরক্ষা বিধানের লক্ষ্য থেকে সুরক্ষা ও উন্নয়ন লক্ষ্যে সরে আসা।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি	**ভৌগোলিক নির্বাচন** মঙ্গাপীড়িত এলাকা, চরাঞ্চল	দারিদ্র্য পকেটের উপস্থিতির ব্যাপকতর স্বীকৃতি।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ ভাগ	**কর্মসসংস্থানের নিশ্চয়তা**	২০০৭-০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি নতুন উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যার ফল হলো কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিতে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার (কর্মহীন সময়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা) অন্তর্ভুক্তি।

উপর্যুক্ত উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার পিছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে। প্রথমটি হলো মানবতাবাদী দর্শন বা মানবিক মূল্যবোধ যা বাংলাদেশের সমাজের গভীরে প্রোথিত এবং এ সমাজের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ দর্শন দুর্যোগজনিত বা কর্মসংস্থানের অভাবজনিত কারণে সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ত্রাণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়। এ মূল্যবোধ থেকে দুটি ভিত্তিমূলীয় কর্মসূচির উদ্ভব হয়। একটি হলো ভিজিএফ যা ১৯৭৪ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারগুলিকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। অন্যটি হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি যা ১৯৭৫ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচিতে মজুরি

হিসেবে খাদ্যশস্য দেয়া হয়। সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় যেসব কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে সেগুলির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এই দুটি কর্মসূচি।

নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রায় দুদশক পর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে নিরাপত্তা বলয় ছাড়াও ক্রমোন্নতির সোপান বা ক্ষমতায়নমূলক উপাদান প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হয় যাতে করে সুবিধাভোগীরা সাময়িক ত্রাণের বাইরেও অধিকতর টেকসই সুবিধা লাভ করতে পারে। মানব উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, সচেতনতা সৃষ্টি), আর্থিক স্বাবলম্বন (সঞ্চয়, আয় পরিপূরক, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তি), কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বা সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে এরূপ উন্নয়ন সোপানমূলক উপাদান প্রবর্তন করা হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্ভাবন ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ধারার প্রচলন ঘটে যা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির প্রসারে তৃতীয় অনুঘটকটি হলো অধিকতর সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় বিপন্ন বিশেষ জনগোষ্ঠীর (যেমন বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং দুস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা) প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির এই অংশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ দশক থেকে যখন নির্বাচনী গণতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান প্রক্রিয়া বিষয়েও অনেক পরীক্ষণ ও উদ্ভাবন চলমান রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাদ্যসহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান, এনটাইটেলমেন্ট কার্ড, ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার, কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ব্যবহার, ভৌগোলিক নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশের পেছনে উল্লেখযোগ্যভাবে চাহিদাতাড়িত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। এগুলির উদ্ভব হয়েছে নতুন গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একইসাথে সংকট উত্তরণ প্রচেষ্টা থেকে। বাংলাদেশ তার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিমূর্ত অধিকারসমূহের আইনগত ধারার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান কর্মসূচি পরীক্ষণের (ইনক্রিমেন্টাল প্রোগ্রাম এক্সপেরিমেন্টেশন) একটি বাস্তবভিত্তিক পথ অনুসরণ করেছে। খাদ্য-নিরাপত্তাভিত্তিক মূল ভিজিডি কর্মসূচি এবং গণপূর্তভিত্তিক পল্লী-অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিসহ অনেক অনুবর্তী কর্মসূচি গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে, যেমন আইজিভিজিডি, এফএসভিজিডি, সিএফপিআর-টিইউপি, রিওপা, আরইআরএমপি ইত্যাদি। এসব কর্মসূচির নকশায় ও প্রসারণের ক্ষেত্রে অধিকতর জটিল লক্ষ্যসমূহকে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশ বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণের উপর জোর দিয়ে ঝুঁকিমুখীতার সমান্তরালে নতুন কর্মসূচির বিকাশ ঘটেছে। এটি পরবর্তীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিকতার (যেমন চরবাসী, বা প্রাথমিকভাবে মঙ্গাপীড়িত এলাকার উপর গুরুত্ব প্রদানকৃত ব্যাপকতর ভৌগোলিক নির্বাচন এবং বর্তমানে হাওর ও উপকূলীয় সম্প্রদায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান) ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এ খাতের বাজেট বরাদ্দ আর্থিক মূল্যে এবং জিডিপির অংশ হিসেবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র ১.৫ এ দেখা যাচ্ছে, জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ ১৯৯৮ সালের ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২.৩ শতাংশ হয়েছে। এরপর থেকে এটি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ মোটামুটি মনে হলেও সরকারের বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে এটি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ (সরকারের মোট ব্যয়ের ১৩ শতাংশ) এবং সামাজিক উন্নয়ন নীতির এই ধারার প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশক।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জটিল যা বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এবং অনেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে বাজেটের অর্থায়নে ১৪৫টি কর্মসূচি রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব কর্মসূচিতে ৩০৬.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা জিডিপির ২.০২ শতাংশ। এসব কর্মসূচি ২৩টি বা তারও বেশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখানে নেই।

চিত্র ১.৫: জিডিপি ও মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়

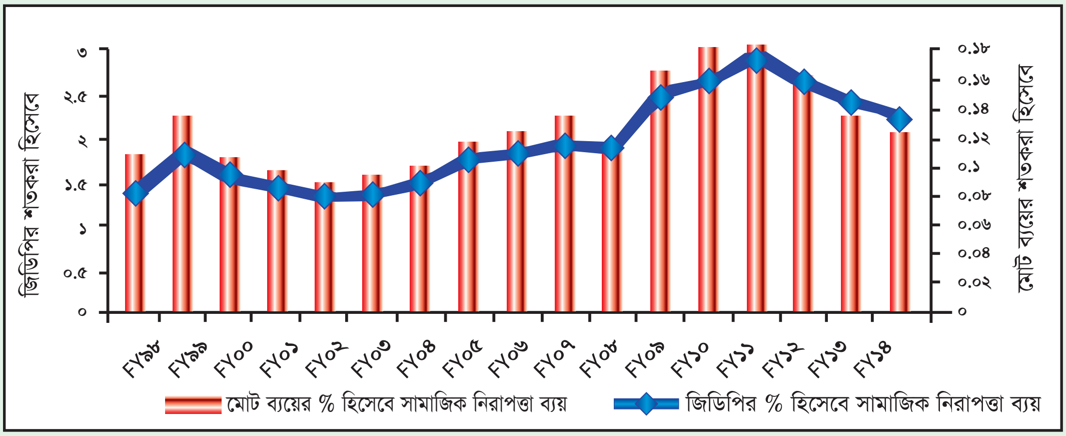

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ব্যাপকমাত্রায় অধিক্রমণ (ওভারল্যাপ) বিদ্যমান এবং অনেক কর্মসূচি আকারে এত ছোট যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উপর তাদের প্রভাব অতি সামান্য। প্রায় ৫৮ শতাংশ কর্মসূচির মোট বার্ষিক বাজেট ৫০০ মিলিয়ন (৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) টাকার চেয়ে কম এবং এ সবগুলি কর্মসূচির বাজেট একত্রে সরকারের মোট সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ের মাত্র ৪ শতাংশ।

প্রধান প্রধান কর্মসূচি ভেদে বণ্টন চিত্র-১.৬ এ দেখানো হয়েছে। প্রধান বা বড় বলতে সেসব কর্মসূচিকে বোঝানো হয়েছে যেগুলির বাজেট ২০১২-১৩ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী এক বিলিয়ন টাকা (১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বা তারও অধিক। প্রায় ২৮টি কর্মসূচি এই পূর্বশর্ত পূরণ করে এবং মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ৯২ শতাংশ ব্যয় হয় এই কর্মসূচিগুলি বাবদ। চিত্র থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বর্তমান কাঠামোর কতিপয় দিক লক্ষ্য করা যায়। ২০১৩ অর্থবছরে শীর্ষ ১০টি কর্মসূচিতে মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের প্রায় ৬৯ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়। বাজেট বরাদ্দ বিবেচনায় হিসাব করলে দেখা যায় যে, সরকারি কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের জন্য পেনশন কর্মসূচি হলো একক সর্ববৃহৎ কর্মসূচি এবং এই কর্মসূচিতে ২০১৩ সালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের শতাংশ হিসেবে অন্য ৯টি প্রধান কর্মসূচি হলো: খোলা বাজারে বিক্রয় (৭.৬ শতাংশ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (৬.৫ শতাংশ), টেস্ট রিলিফ (৫.৫ শতাংশ), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (৫.২ শতাংশ), অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (৫.২ শতাংশ), প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি (৪ শতাংশ), বয়স্ক ভাতা (৩.৯ শতাংশ), ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (৩.৭ শতাংশ) এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে থোক বরাদ্দ (৩.৫ শতাংশ)। অবশিষ্ট ১৮টি প্রধান কর্মসূচি মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের শতাংশ হিসেবে এখনো আকারে অনেক ছোট। এই ১৮টি কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচিপ্রতি মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ২.৮ শতাংশ বা তার চাইতেও কম বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে সবগুলি কর্মসূচির বরাদ্দ একত্রে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ। এটি নির্দেশ করে যে কর্মসূচিসমূহের সংখ্যাধিক্য ও পুনরাবৃত্তির প্রেক্ষিতে আলোচ্য কর্মসূচিসমূহকে সহজেই একীভূত করা সম্ভব এবং এর ফলে কর্মসূচিসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা আরও দক্ষ হবে এবং পরিচালন ব্যয়ও কমে যাবে।

সুবিধাভোগীর সংখ্যা বিবেচনায় এসব কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অতিসংখ্যায়ন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ৩০৬.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়; প্রায় ৮১ মিলিয়ন সুবিধাভোগী এসব কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে। এটি একটি স্থূল সংখ্যা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে এই অর্থে যে এটি একটি কর্মসূচির প্রতিটি সুবিধাভোগীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছে অথচ এমন হতে পারে যে অনেক ব্যক্তি একাধিক কর্মসূচি থেকে একই সময়ে উপকার বা সুবিধা পেয়েছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ থেকে দেখা যায়, মোট খানার প্রায় ২৪.৫ শতাংশ কমপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেয়েছে। সংখ্যার বিবেচনায় এখানে উপকারভোগীর সংখ্যা হতে পারে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন, যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অর্থমন্ত্রণালয় কতৃক হিসাবকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যার চেয়ে আয়-ব্যয় জরিপে সুবিধাভোগীর সংখ্যা কম হওয়ার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। প্রথমত, অর্থবছর ২০১৩ এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর মধ্যকার সময়ের ব্যবধান হবে ৩ বছর। দ্বিতীয়ত, আয়-ব্যয় জরিপে সুবিধাভোগী খানার যথাযথ প্রতিফলন হবার সম্ভাবনা কম এবং এ জরিপে সামাজিক নিরাপত্তামূলক অনেক কর্মসূচি বাবদ তথ্য বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হয় এবং এ সমস্যা থেকেই একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (এমআইএস) প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

চিত্র ১.৬: প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বণ্টন (২০১২-১৩ অর্থবছরের সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের % হিসেবে)

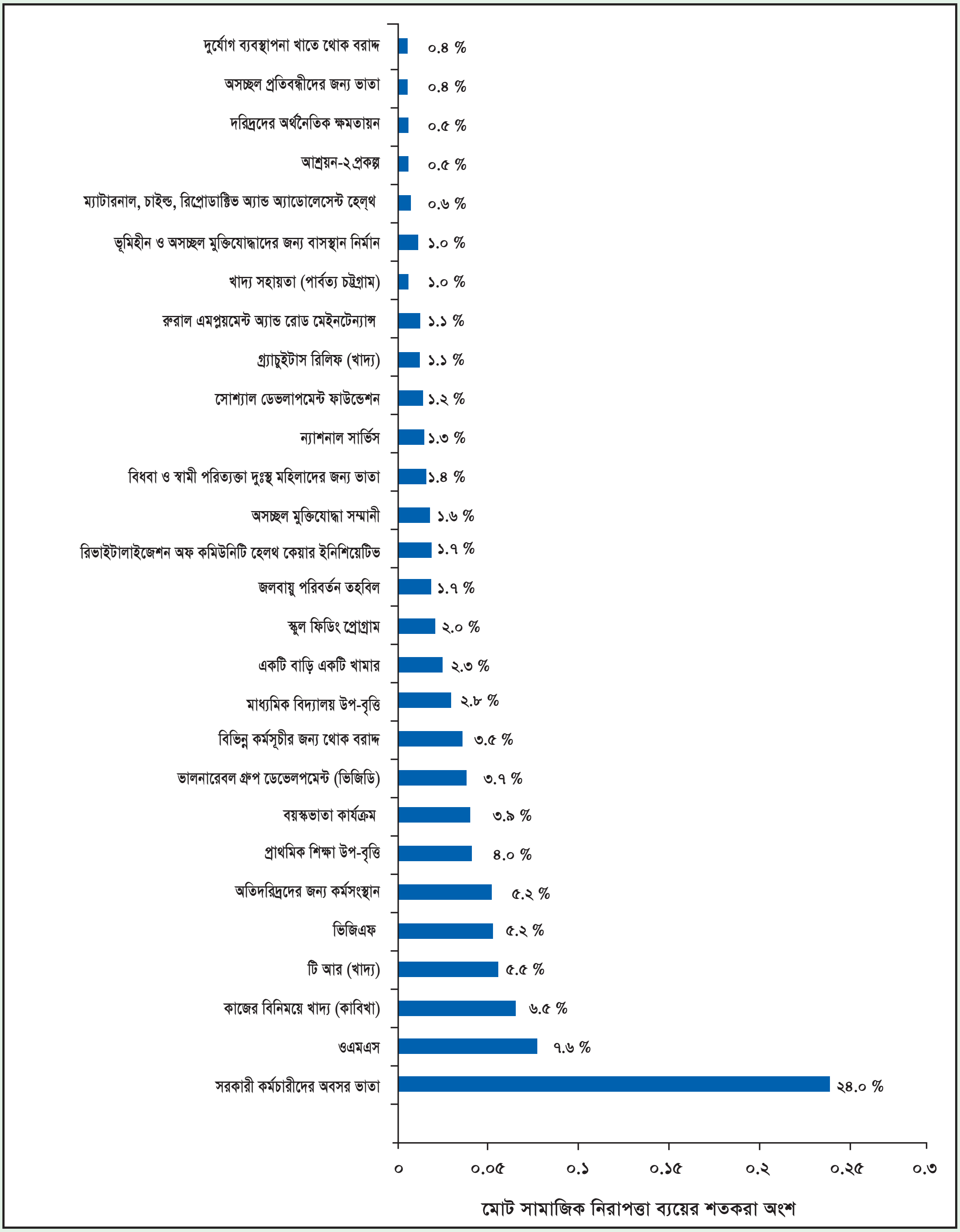

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ১.৭: প্রধান কর্মসূচির ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের বণ্টন

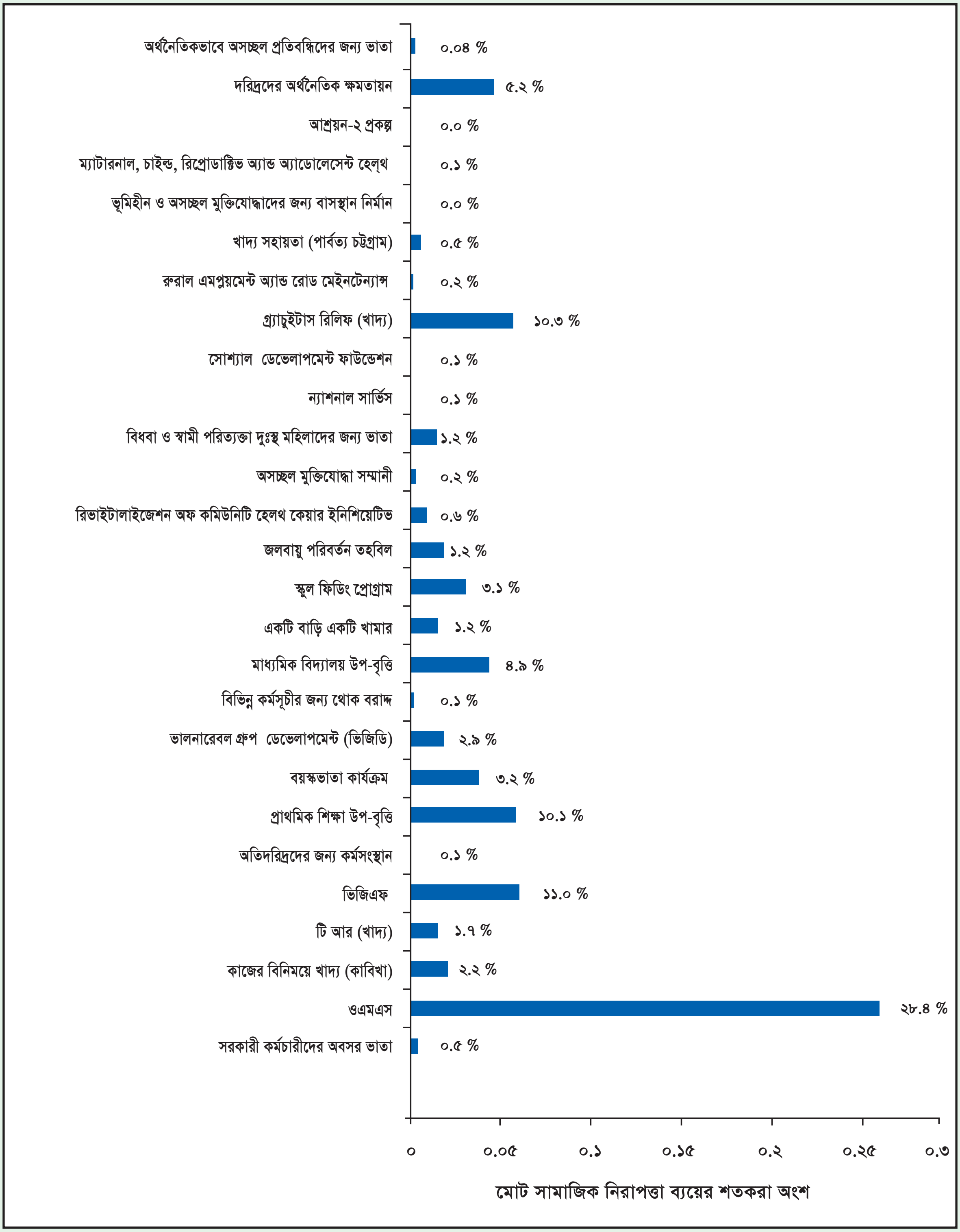

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ১.৭ এ প্রধান কর্মসূচি ভেদে সুবিধাভোগীদের বিভাজন দেখানো হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোট সুবিধা ভোগীর ৭০ শতাংশ ৬টি প্রধান কর্মসূচির আওতাভুক্ত। এই ৬টি কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)। মোট সুবিধাভোগীদের ২৮ শতাংশ এর আওতায় সুবিধা ভোগ করেছে। এর পরেই রয়েছে ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং কর্মসূচি (মোট সুবিধাভোগীর ১১ শতাংশ), গ্রাটুইটাস রিলিফ ফুড কর্মসূচি (মোট সুবিধাভোগীর

১০.৩ শতাংশ), প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি (১০.১ শতাংশ), ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম অব দি পুওর কর্মসূচি (৫.২ শতাংশ) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি (৪.৯ শতাংশ)। সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের অংশ হিসেবে এসব কর্মসূচির মোট বরাদ্দ মাত্র ২১ শতাংশ। মোট সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীর মাত্র ০.৫ শতাংশ সরকারের পেনশন কর্মসূচির আওতাভুক্ত যদিও মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটে পেনশন কর্মসূচির অংশ প্রায় ২৫ শতাংশ।

বর্তমান কর্মসূচিসমূহের কাঠামো অধিকতর কৌশলগত ও বিশ্লেষণমূলক উপায়ে দেখার একটি উপায় হলো জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কর্মসূচিসমূহকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা। দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষ জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে নানা ঝুঁকি, অভিঘাত, বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে (চিত্র ১.৮)। কিছু ঝুঁকি রয়েছে যেগুলি সময়মত মোকাবেলা না করা হলে সেগুলি জীবনব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভকালীন সময়ে বা সন্তান প্রসবের সময়ে একজন মায়ের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা বা নবজাতকের (০-২ বছর বয়সী) সেবাযত্ন সঠিকভাবে করা না হলে ভবিষ্যত জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে, একজন বয়স্ক (ষাটোর্ধ্ব) দরিদ্র মানুষের ঝুঁকিসমূহ কর্মক্ষম বয়সের দরিদ্র মানুষদের ঝুঁকিসমূহ থেকে অধিকতর চ্যালেঞ্জিং হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান ঝুঁকিসমূহে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এসকল পার্থক্যকে বিবেচনায় নিয়ে সেগুলিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে থাকে। আবার কোনো কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জীবনচক্রভিত্তিক ঝুঁকিসমূহের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে সাড়া দেওয়া হয়না। দেখা গেছে যে প্রথমোক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে অধিকতর কার্যকর সহায়তা প্রদান করা সম্ভব।

চিত্র ১.৮: জীবনচক্রের ঝুঁকিসমূহ

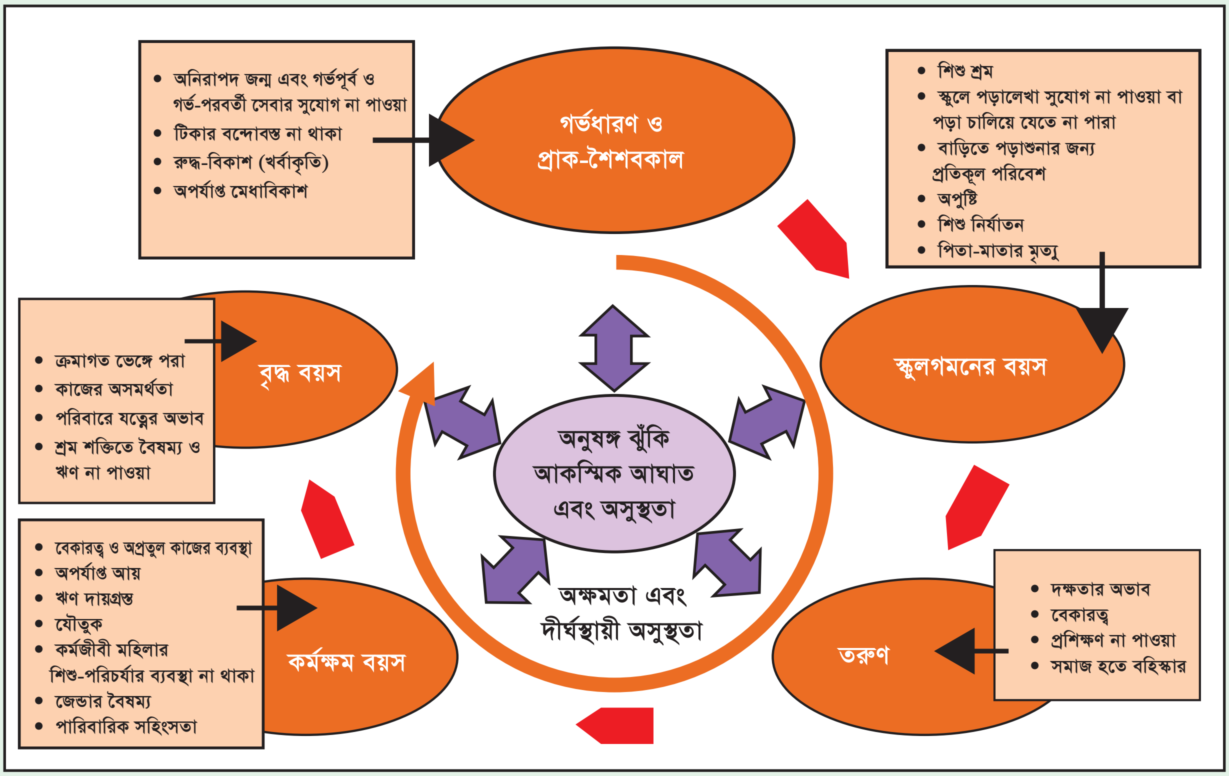

সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক যে বেশিরভাগ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জীবনচক্রের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। বস্তুত, বিভিন্ন জনমিতিক শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে । তবে যারা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়ে যায় বা যাদের বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন হয় তাদের জন্য বেশির ভাগ দেশেই ছোট আকারের বিশেষ সুরক্ষা বেষ্টনী প্রচলিত রয়েছে। জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি বৃহৎ পরিসরে মূলত সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোরের উপর ভিত্তিপ্রাপ্ত, যা জাতিসংঘ ও বাংলাদেশসহ এর সকল সদস্য দেশ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, যদিও জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামো এখনো পর্যন্ত সরকারের আনুষ্ঠানিক কৌশল হিসেবে স্বীকৃত নয় তবুও চলমান অনেক কর্মসূচী এ কাঠামোতে শেষ পর্যন্ত খাপ খায়।

তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের একটি বড় অংশ সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে (সাধারণ উদ্দেশ্যে গৃহীত) ব্যয়িত হয়। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও অর্থায়ন দুদিক থেকেই গর্ভকালীন ও প্রাক-শৈশবকালীন এবং প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ হ্রাসকল্পে গৃহীত কর্মসূচির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম । বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি (সরকারের পেনশন কর্মসূচি বাদে) থেকে প্রাপ্ত গড়সুবিধা খুবই অপ্রতুল এবং বিপুল সংখ্যক বয়স্ক মানুষ এ কর্মসূচির বাইরে থেকে যায়। প্রতিবন্ধী ভাতা ও দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

১.৫ দারিদ্র্যের উপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিডিপির ২ শতাংশ ব্যয় হয় যা বাজেট সীমাবদ্ধতার বাস্তবতায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়। সুতরাং, এটা প্রত্যাশিত যে ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জিত হবে। জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব বিভিন্ন নির্দেশকের মাধ্যমে নিরূপণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো ক্ষুধা হ্রাস, দারিদ্র্যের উপর প্রভাব এবং দারিদ্র্যের গভীরতা হ্রাস।

বাংলাদেশের একটি অন্যতম বড় অর্জন হলো ক্ষুধাভিত্তিক দারিদ্র্যের প্রকোপ দ্রুত হ্রাস করতে পারা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১২ থেকে দেখা গেছে, মোট জনসংখ্যায় ক্ষুধার্ত মানুষের হার ১৯৯০ সালের ৩৪.৬ শতাংশ থেকে নেমে ২০১২ সালে ১৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়কালে মোট সংখ্যার বিবেচনায় ক্ষুধাপীড়িত মানুষের সংখ্যা ৩৭ মিলিয়ন থেকে কমে ২৫ মিলিয়ন দাঁড়িয়েছে। এটি কম বড় অর্জন নয়। কৃষি খাতে, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে, যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হওয়া এবং ১৯৭৫ সাল থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে খাদ্য নিরাপত্তার উপরে জোর দেওয়ার কারণেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসের উপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব সারণি ১.২ এ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অনুকৃতি (সিমিউলেশন) পরিচালনা করা হয়েছে এবং জরিপে উল্লিখিত ৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে এ অনুকৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ৩০টি কর্মসূচি আসলে ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ।

সারণি ১.২ এর ১ম সারিতে খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল দেখানো হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপে এ ফলাফলকে ভিত্তিতথ্য (বেইজলাইন) হিসেবে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় সারিতে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার অনুপস্থিতিতে পরিচালিত অনুকৃত (সিমিউলেটেড) অনুযায়ী দারিদ্র্যপ্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ের অনুপস্থিতিতে দারিদ্র্যহার হবে প্রায় ৩৩ শতাংশ, যা প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে ১.৫ শতাংশ বেশি। দারিদ্র্যের গভীরতাও একইভাবে আরও বেশি হবে। প্রয়োজনের তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ায় দরিদ্রদের উপর প্রাক্কলিত প্রভাবের তুলনায় অতিদরিদ্রদের উপর দারিদ্র্যপ্রভাব কিছুটা কম। দারিদ্র্য কমাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় সহায়তা করেছে সে বিবেচনায় এ ফলাফল স্বস্তিদায়ক হলেও কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ কতটুকু দক্ষভাবে ব্যয়িত হয়েছে তা নির্দেশ করে না। এ বিষয়টির পরিমাপ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দুটি অতিরিক্ত সিমুলেশনের ফলাফল সারণি ১.২ এ দেখানো হলো।

সারণি ১.২: সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ের দারিদ্র্যপ্রভাব

অনুকৃতি (সিমুলেশন)	দারিদ্র্য হার (মাথাগুনতি সূচক)	দারিদ্র্য ব্যবধান	দারিদ্র্য গভীরতা (দারিদ্র্য ব্যবধান/ দারিদ্র্য হার)
উচ্চ দারিদ্র্যরেখার বিপরীতে			
খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর ফলাফল	৩১.৫	৬.৫	২০.৬
সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ব্যতীত ফলাফল	৩৩	৭.৪	২২.৪
সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাসহ ফলাফল (চরম দরিদ্রদের লক্ষ্য করে গৃহিত)	৩২	৫.৮	১৮.১
সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাসহ ফলাফল (দরিদ্রদের লক্ষ্য করে গৃহিত)	২৯	৬	২০.৭
নিম্ন দারিদ্র্যরেখার বিপরীতে			
খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর ফলাফল	১৭.৬	৩.১	১৭.৬
সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ব্যতীত ফলাফল	১৯.১	৪.১	২১.৫
সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাসহ ফলাফল (চরম দরিদ্রদের লক্ষ্য করে গৃহিত)	১৩.৫	২.২	১৬.৩

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নির্ভর অনুকৃতি (সিমুলেশন)।

সারণি ১.২ এর ৩নং সারিতে দারিদ্র্যপ্রভাবকে এমনভাবে সিমুলেট করা হয়েছে যাতে করে ২০১০ সালের প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় যদি চরম দরিদ্রদেরকে লক্ষ্য করে সঠিকভাবে পরিচালিত হতো তার ফলাফল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে মাথা গুণতি সূচক এর হ্রাস (উচ্চ দারিদ্র্যরেখার উপর ভিত্তি করে) অর্থে দারিদ্র্যপ্রভাব নগণ্য হলেও চরম দারিদ্র্য (নিম্ন দারিদ্র্যরেখার উপর ভিত্তি করে) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস ছাড়াও দারিদ্র্যগভীরতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য হ্রাস হতো। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে নির্বাচন পদ্ধতি সঠিকভাবে পরিচালিত হলেও যেখানে চরম দরিদ্রদের কাছে মাথাপিছু সম্পদ হস্তান্তর অনেককে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে পারলেও তাদেরকে উচ্চ দারিদ্ররেখার উপরে উঠিয়ে আনতে অর্থ হস্তান্তরের পরিমাণ যথেষ্ট হতো না।

সারণি ১.২ এর ৪ নম্বর সারিতে দরিদ্র গ্রুপের (উচ্চ দারিদ্র্যরেখার ভিত্তিতে) ক্ষেত্রে পরিচালিত সঠিক নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সঠিক হলে দারিদ্র্যহ্রাসের উপর প্রভাব আরো ইতিবাচক হতো বলে দেখা যায় দারিদ্র্যের প্রকোপ কমে ২৯ শতাংশ হতো, যা ভিত্তি সংখ্যার চেয়ে ২.৫ শতাংশ কম (খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০)।

এসব সিমুলেশন দরিদ্রদের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা বণ্টনে বিদ্যমান ব্যবস্থার অদক্ষতারই নির্দেশক। এটা স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিখুঁতভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন করাটা পুরোপুরি বাস্তবসম্মত নয়। তবে দারিদ্র্যহার হ্রাসের কর্মসম্পাদনে দক্ষতার অভাব গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে যে কর্মসূচিগত ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ সমাধানের চেষ্টা করে এমন একটি অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থা থাকলে তা আরো ভালো ফল পেতে সাহায্য করবে। সিমুলেশনের ফলাফল খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এ অন্তর্ভুক্ত প্রকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমুহের উন্নততর নকশা-পরিকল্পনা ও দক্ষ বাস্তবায়ন দারিদ্র্যহ্রাসের উপর এদের কার্যকরী প্রভাব আরো বৃদ্ধি করবে।

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর ফলাফল ব্যবহার করে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমুহের উপকারভোগীদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অবলোকন করে আরো কিছু ধারণা লাভ করা যেতে পারে। চিত্র ১.৯ -এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২৪.৫ শতাংশ পরিবার জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৩০টি কর্মসূচির অন্তত পক্ষে একটি থেকে হলেও উপকৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৩৪ শতাংশ ছিল দরিদ্র খানাভুক্ত এবং ৪৩ শতাংশ ছিল অতিদরিদ্র খানাভুক্ত। এছাড়া প্রায় ৩২ শতাংশ ছিল ঝুঁকিপ্রবণ গ্রুপভুক্ত এবং ১৮ শতাংশ ছিল সচ্ছল খানাভুক্ত। মোট কথা, উপকারভোগীদের বণ্টন দারিদ্র্যপরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান বলে প্রতীয়মান হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীর কতজন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এসেছে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ একটি দক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত লোকদেরকে ঝুঁকি মোকাবেলায় বা ঝুঁকির সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা। চিত্র ১.৯ থেকে দেখা যায় যে, চরম দরিদ্রদের প্রায় ৫৭ শতাংশ ও দরিদ্রদের ৬৬ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে। ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে যদি আওতা ও পরিধি বাড়ানো হয় তা হলে পরিবারগুলির কর্মসূচির বাইরে থাকা বা কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে যাবার হার বেড়ে ৬৯ শতাংশে দাড়াবে। যখন এই ফলাফলকে বেশিরভাগ বৃহৎ কর্মসূচি কর্তৃক প্রদত্ত নিম্ন গড় সুবিধার সাথে সমন্বিত করা হয়, তখন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জটা আরও বড় হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্র ১.৯: উপকারভোগীদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০

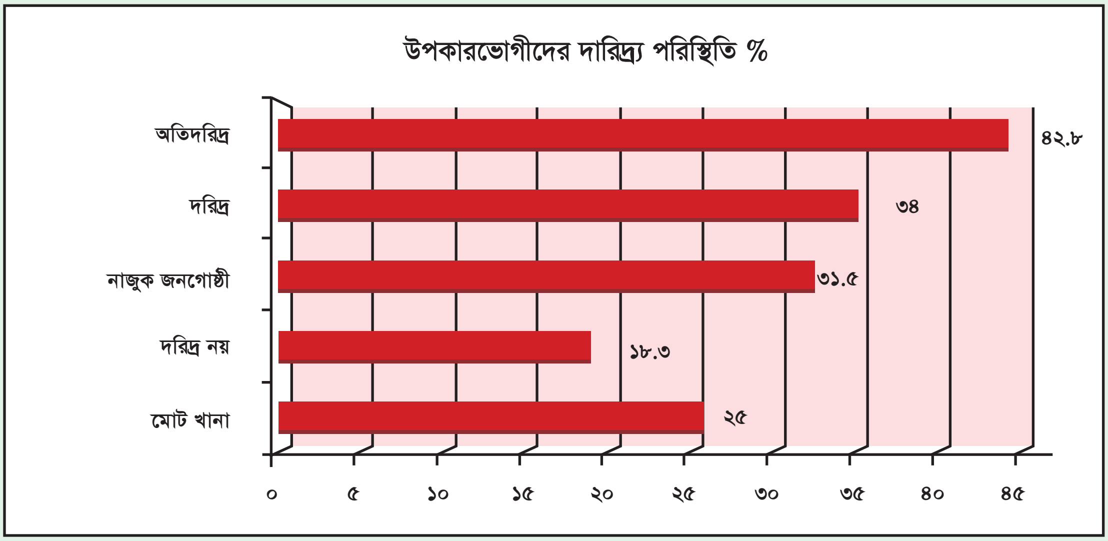

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত অনুকৃতি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন হলো স্থান ভেদে কর্মসূচিসমূহ কতটুকু বিস্তৃতি লাভ করেছে? দেখা গেছে, বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে গ্রামীণ দরিদ্র খানার অন্তর্ভুক্তি ৩০.১২ শতাংশ এবং নগর দরিদ্র খানার অন্তর্ভুক্তি ৯.৪২ শতাংশ। দেশের সকল বিভাগের বেলায়ও গ্রাম-শহরভিত্তিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যাহোক, স্থানিক মাত্রায় নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলির একটি ইতিবাচক দিক এই যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের তুলনায় দরিদ্রতর রংপুর, বরিশাল ও খুলনা অনেক বিভাগে কর্মসূচিসমূহ অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করেছে।

১.৬ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা প্রয়োজন হবে। নিম্নে এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি যেমন খুবই কার্যকর, তেমনি এটি দারিদ্র্য হ্রাসেও সহায়তা করে।

- কর্মসূচিসমূহের সংখ্যাধিক্য (১৪৫টি), সহায়তার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বিবেচনায় কর্মসূচিসমূহের ছোট আকার এবং কর্মসূচি পরিচালনার সাথে জড়িত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা (২৩টি) এটাই নির্দেশ করে যে এ ধরনের বহুধাবিভক্ত ব্যবস্থা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো কার্যকর উপায় নয়। শক্তিশালী তথ্যব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এসব কর্মসূচিকে স্বল্পসংখ্যক কর্মসূচিতে নামিয়ে এনে তাদেরকে সমন্বিত উপায়ে বাস্তবায়ন করা হলে প্রশাসনিক ব্যয় ও অপচয় এবং দুর্নীতি হ্রাস করার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করা যাবে।

- জীবনচক্র পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহের একটি অধিকতর কৌশলগত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে যে, যদিও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের ৬৫ শতাংশ জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় নিয়োজিত, এক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। গর্ভকালীন ও প্রাক-শৈশবকালীন এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্মসূচিসমূহের আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা যেমন কম তেমনি বরাদ্দের পরিমাণও (সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি ব্যতীত) কম। একইভাবে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমস্যা ও জটিলতা মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহও আকারে ছোট ও সংখ্যায় কম।

- বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে যেমন দেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, ঐতিহ্যগতভাবে তাদের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া (বিশেষত অতি দরিদ্রদের মাঝে), গ্রাম থেকে ক্রমবর্ধমান হারে শহরে অভিবাসন এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়ন। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পাশাপাশি এগুলির সাথে অভিযোজনে সক্ষম হতে হবে।

- উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ ও অর্থায়নের দিক দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গত দশ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির দ্রুত গতির সাথে কৃষি ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যসহ ক্ষুধা, খাদ্যাভাব ও খাদ্যদারিদ্র্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, কৃষি শ্রমবাজার সংকুচিত হচ্ছে (কৃষির প্রকৃত মজুরির ক্রমবৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত)। অর্থনৈতিক কাঠামোচিত্রের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের স্বরূপ ও ঝুঁকি পরিস্থিতিরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তবে অবশিষ্ট দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলসমূহ যেমন চরাঞ্চল, হাওর এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ী এলাকা ইত্যাদির জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারছে না। একবিংশ শতাব্দীতে দেশের জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন পূরণে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের পর্যাপ্ততা বা যথার্থতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বহুলাংশে গ্রামীণ দরিদ্রদের ঝুঁকি হ্রাসের উপর জোর প্রদান করে। বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রম অগ্রসরমান। একদিকে জিডিপি ও কর্মসংস্থানে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে নগর এলাকার বস্তিসমূহে দরিদ্র ও ঝুঁকিপ্রবন জনগোষ্ঠীর চাপ বেড়ে চলেছে। কর্মসূচির এসব পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিধারাকে কৌশলগতভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যা বসবাসের স্থান বা এলাকা নির্বিশেষে দরিদ্র ও ঝুঁকিপ্রবন জনগোষ্ঠী যেসব ঝুঁকিতে রয়েছে সেগুলিরর উপর দৃষ্টি দিতে পারে।

- এটি অনস্বীকার্য যে, নগর ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। নগর এলাকায়ও স্থানভেদে নগরদারিদ্র্যের রূপ ও ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেমন বৃহৎ নগরগুলোতে তা একরকম ও ছোট শহরগুলোতে অন্যরকম হতে পারে। গ্রামীণ দরিদ্রদের

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেখানে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সেখানে নগর দরিদ্ররা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত হচ্ছে, যা শ্রমিকদের সুরক্ষায় শ্রমবাজারমূলক পদক্ষেপ এবং সামাজিক নিরাপত্তায় তাদের সম্পৃক্তকরণকে সামনে নিয়ে আসে। গ্রামীণ দারিদ্র্য সমাধানে যেসব প্রথাগত সুফলভোগী নির্বাচন কৌশল ভালোভাবে কাজ করে সেগুলি নগরদরিদ্রদের ভিন্ন ধরনের ঝুঁকির সমাধানে কাজ নাও করতে পারে। নগর এলাকায় আয়দারিদ্র্য অনেক কম হলেও এখানকার দরিদ্রদের জন্য নানা বিকাশমান ঝুঁকি রয়েছে যেমন সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সম্পত্তির ভোগদখল অধিকার, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পুষ্টি ইত্যাদি।

- দুর্যোগপ্রবন বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন নতুন দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে: উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, নিম্নাঞ্চলীয় হাওর এলাকার জনগোষ্ঠী, এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দ।

- বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তির প্রাধান্য রয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হতে চায়। ইতোমধ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু অর্থনীতির পরিধি ও আকার বাড়ছে, জিডিপি ও কর্মসংস্থানে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও সুসংগঠিত সেবাখাতের অংশ বাড়ছে, সেহেতু নাটকীয়ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রয়োজন ও চাহিদা পরিবর্তিত হবে। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বর্তমানের প্রচলিত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে ভিন্ন হবে। সামাজিক বিমা ও কর্মসংস্থান বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার কৌশলের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। তৈরি-পোশাক খাতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ক আলোচনা হচ্ছে।

- বাজেটের মাধ্যমে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার ক্রমবৃদ্ধি বেশ প্রশংসনীয়। তবে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের সীমিত অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে যে অর্থ ব্যবহারে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটালেও মধ্যম আয়ের একটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বর্তমান বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। একটি সুগঠিত ও সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন সংক্রান্ত চাহিদার নিরূপণ এবং অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করা আজ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলকে সম্মুখে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে।

- সিমুলেশন-এর ফলাফল থেকে দেখা যায়, দারিদ্র্য-প্রভাব নিরসনে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহের সংহতির সহজীকরণ ছাড়াও কর্মসূচির নকশা ও উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য, দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ও সেই সাথে সচ্ছলদেরকে বাদ দিতে একটি সুচিন্তিত পদ্ধতির ব্যবস্থা করা নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যালেঞ্জ বলে পরিগণিত হবে। এছাড়া অন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলো সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন দুস্থ মহিলা (বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাসহ), প্রতিবন্ধিতার শিকার জনগোষ্ঠী এবং উচ্চ ঝুঁকিতে বসবাসকারী গোষ্ঠীসমূহ, যেমন এইচআইভি/এইড্স আক্রান্ত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়, গৃহহীন, বাস্তুচ্যুত ও পথশিশু, এদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া।

- বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অভাব। জাতীয় পর্যায়ে বা মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন দক্ষতা পর্যালোচনা করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। অবশ্য দাতাদের সহায়তায় সম্পাদিত কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয় করার জন্য পরিচালিত কিছু সমীক্ষা থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উপরে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অভাবই মূলত বিরাট সংখ্যক কর্মসূচির উদ্ভবের পেছনে একটি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা ও ভিত্তিরেখার বিপরীতে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রেও একে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৭ সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার উপায়

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাপক। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে ব্যাপকভিত্তিক ও সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কৌশল বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহ থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং অনুসরণীয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের এজেন্ডা নির্ধারিত হবে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত যেসব অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিতে থাকে জীবনচক্র কাঠামোর প্রেক্ষিতে সেগুলিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা বিষয়ে ধারণা পেতে দারিদ্র্য-চিত্রের বিপরীতে চলমান কর্মসূচিসমূহকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক সম্মুখীন হওয়া ঝুঁকিসমূহ কীভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তিত হবে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা কাঠামোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

যদিও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, উত্তম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়েও বাংলাদেশ বিপুলভাবে উপকৃত হতে পারে। বাংলাদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশও একই ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এসব উত্তম উদাহরণ চিহ্নিত করে সেগুলিকে বাংলাদেশে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করা গেলে তা অনেক ফলদায়ক হতে পারে। সেমতে, তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুসরণীয় চর্চা বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার একটি কৌশল তৈরির নিমিত্ত প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে চতুর্থ অধ্যায় রচিত হয়েছে। কৌশলটি তাৎক্ষণিক ও জরুরি চ্যালেঞ্জসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করেছে। স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য হলো সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, কর্মসূচিসমূহ ব্যাপকভাবে সংহত করা এবং সেবাপ্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যা প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারপূর্বক সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে। অন্যদিকে, যেহেতু বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগোচ্ছে সেহেতু দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক গতিধারাকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এ দীর্ঘমেয়াদি কর্মসমষ্টির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র্য ও ক্রমবর্ধমান অসমতা মোকাবেলা ও প্রতিরোধে সরকারের প্রচেষ্টাকে সহায়তাকরণে কার্যকর এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।

একটি সুষ্ঠু কৌশল অবশ্যই অর্থায়নযোগ্য হতে হবে। সম্প্রসারিত ও সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সরকারি সম্পদ ছাড়াও বেসরকারি তহবিল সংস্থানের প্রয়োজন হবে। পঞ্চম অধ্যায়ে কৌশলের অর্থায়নের উপর আলোকপাত করার পাশাপাশি কৌশলটির অর্থায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা কী হবে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

একটি উত্তম কৌশলের জন্য শুধু অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকলেই হবে না বরং সেটিকে উত্তমভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিদ্যমান বাস্তবায়নব্যবস্থা পর্যালোচনা করা ছাড়াও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সুনির্দিষ্ট ঘাটতি ও সমস্যা রয়েছে সেগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত কৌশলের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কিছু পথনির্দেশক নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন খুবই সহায়ক হবে। কতটুকু কার্যকরভাবে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এগুলি প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত প্রদানের ব্যবস্থা করে পরিবীবক্ষণ ও মূল্যায়ন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচির পরিমার্জন ও সংশোধনে সহায়তা করতে পারে। সপ্তম অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে জাতীয় পর্যায়ের ও কর্মসূচি পর্যায়ের কর্মকাণ্ডসমূহের জন্য উত্তম ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ঝুঁকি এবং বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগসমূহের যথার্থতা

অধ্যায় ২
দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ঝুঁকি এবং বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগসমূহের যথার্থতা

২.১ ভূমিকা

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য কেবল দারিদ্র্য মোকাবেলাই নয়, যেসব ঝুঁকি, অভিঘাত ও সংকটের কারণে পরিবারসমূহ সহজেই দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে বা আরো গভীরতর দারিদ্র্যে পতিত হতে পারে সেগুলি থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়াও এর আওতায় পড়ে। যেমন অসুস্থতা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনেতিক মন্দাজনিত যৌথ অভিঘাতের (কোভেরিয়েট শকস্) মতো কিছু সংকট আছে যেগুলি যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সেইসব ঝুঁকি যা একজন ব্যক্তি তার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) মোকাবেলা করে থাকে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যেসব ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলি মোকাবেলা করতে বেশিরভাগ দেশেই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বস্তুত, একটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূলধারায় থাকে জনমিতিক বিভাজন অনুযায়ী গড়ে ওঠা ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষা বা সহায়তা কার্যক্রম। অবশ্য অধিকাংশ দেশেরই যৌথ ঝুঁকি (কোভেরিয়েট রিস্ক) মোকাবেলায় জনগণকে বাড়তি সহায়তা প্রদানের জন্য ছোট পরিসরের বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে।

এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোর সাথে জড়িত দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও ঝুঁকি বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান কাঠামো বিশ্লেষণের পাশাপাশি পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জনমিতির প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যথার্থতা ও পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[৪]

২.২ জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিম্নে আলোচিত হলো:

২.২.১ গর্ভধারণ এবং শৈশবকাল

চিত্র ২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী যেসব পরিবারে ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তান রয়েছে সেসব পরিবারে দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র্য হারের চেয়ে অনেক বেশি (৪১.৭ শতাংশ)। এ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে মায়েরা কোনো উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম না হলে পরিবারে কম বয়সী সন্তান থাকলে তা অতিরিক্ত ব্যয় ও চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, অনেক নারীকেই (বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত নারীরাসহ) সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজ ছেড়ে দিতে হয়। যখন প্রায় দরিদ্য পরিবারগুলিকে এই হিসাবের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তানবিশিষ্ট প্রায় ৫৭ শতাংশ পরিবারকে হয় দরিদ্র অথবা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পতিত পরিবার হিসেবে গণ্য করা যায়।[২]

চিত্র ২.১: বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়ে বিশিষ্ট পরিবারে দারিদ্র্য হার, ২০১০

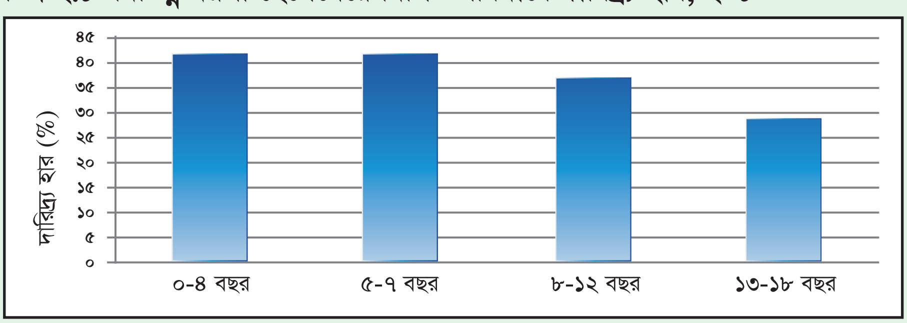

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

[৪] পটভূমিপত্র ১,২,৩, ৫ ও ৮ এ উল্লিখিত গবেষণাকর্মের উপর ভিত্তি করে এই অধ্যায় রচিত হয়েছে। পটভূমিপত্রসমূহের তালিকা সংযুক্তি ১-এ প্রদান করা হয়েছে। এসব পটভূমিপত্রে এ অধ্যায়ের চেয়ে অনেক বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ অধ্যায়ের বিশ্লেষণে সহায়তাকল্পে ব্যবহৃত সকল গবেষণার তালিকাও এ অধ্যায়ের চেয়ে বেশি।

শৈশবে শিশুরা অপুষ্টিজনিত কারণে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হলো বয়সের তুলনায় উচ্চতা ও ওজন কম হওয়া। অপুষ্টি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত করে, যার প্রভাব হয় জীবনব্যাপি। চিত্র ২.২ এ ২০০৪ ও ২০১৪ সালের মধ্যে কম উচ্চতাসম্পন্ন বা খর্বকায় ও কম ওজনের শিশুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, খর্বকায় শিশুর হার ২০১৪ সালে কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে, যা ১৯৯০ সালে ছিল ৬৮ শতাংশ। শিশুর খর্বকায় হবার হার কমলেও এক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খর্বাকৃতি শিশুর হার (৩৮ শতাংশ) শহর এলাকার (৩১ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

চিত্র ২.২: বাংলাদেশে অপুষ্টি হ্রাসের প্রবণতা (২০০৪-১৪)

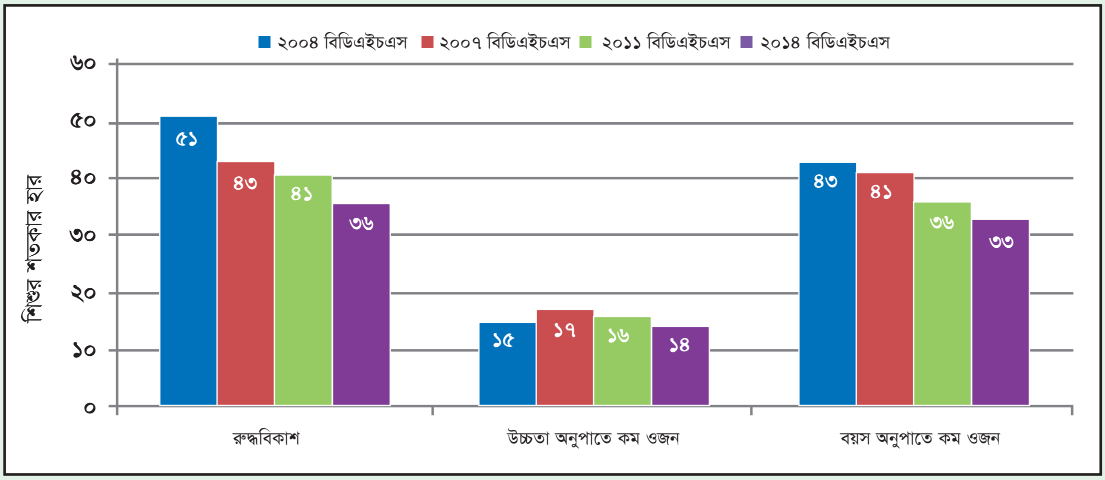

উৎস: বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস), ২০১৪, রিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শিশুর খর্বকায় হওয়ার কারণ নানাবিধ ও জটিল ধরনের। তবে দারিদ্র্য হ্রাস ও অধিকতর পুষ্টি যোগানের মধ্যে জোরালো আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে; উচ্চতর আয় অপুষ্টি হ্রাসে সহায়তা করে। দরিদ্র পরিবারগুলিতেই খর্বাকৃতি শিশু জন্মের হার বেশি হয়ে থাকে। আয়স্বল্পতা পুষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ তা খাদ্যবৈচিত্র কমিয়ে দিয়ে একে শুধু ভাত নির্ভর করে ফেলে। আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যহ্রাসের সাথে সাথে দেশে শিশু ও কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য যোগানে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

২.২.২ বিদ্যালয় গমনকাল

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হলো স্কুলে ভর্তি হওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সী দরিদ্র শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৭২ শতাংশ যা ২০১০ সালে বেড়ে ৭৮ শতাংশ হয়েছে এবং ১১-১৫ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ হয়েছে। এই উভয় বয়স-গ্রুপে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বেশি। ভর্তির হার বৃদ্ধি পাওয়া একটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা। তবে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে এখনও আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে থেকে যাওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এগুলির মধ্যে দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ। উচ্চতর বয়স শ্রেণিভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে দারিদ্র্যহার কম হয়ে থাকে এবং তার কারণ হলো এদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। ৫-১৭ বছর বয়সীদের প্রায় ১৭.৫ শতাংশ শিশু শ্রমিক। তবে, ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২৪ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ হার আরও বেশি হয়ে থাকে। শিশু শ্রমিকদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় আর তা হয়েছে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিশুশ্রম ও বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ দারিদ্র্য। কিছু কিশোরী মেয়ের উপর তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে বিধায় তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয় এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। শিশু পরিচর্যার অভাব এটাই নির্দেশ করে যে যদি নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজে ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদেরকে সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিতে হবে।

২.২.৩ তরুণ জনগোষ্ঠী

কিশোর-কিশোরী ও তরুণদেরকে যে প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হলো তাদের দক্ষতার অভাব। তাদের অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না এবং তা পরিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, একদিকে যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সমতুল্য কোনও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ নেই; অন্যদিকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং উত্তরণসহায়ক কোন কর্মসূচিরও প্রচলন নেই। বস্তুত, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে প্রায়শই এ অভিযোগ করা হয় যে দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা একটি বড় প্রতিবন্ধক এবং একই কারণে তৈরি-পোশাক কারখানাগুলিকে ঢাকার বাইরে স্থাপন করা সম্ভব হয়না। অবশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রম বাজারের জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়।

দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ তরুণের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো যে তারা গ্রামীণ বেকারত্বের ঘেরাটোপে আটকে থাকেন। যদি কিশোর-কিশোরী ও তরুণেরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন না করে তাহলে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তি ও নির্ভরতার নিম্ন অনুপাতজাত জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধাকে পরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে না পারার আশংকা রয়ে যায়।

২.২.৪ কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠী

দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী যে বেকারত্বের সম্মুখীন তা কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ থেকে দেখা গেছে, যেখানে উন্মুক্ত বেকারত্বের হার ৪.১ শতাংশ, সেখানে কর্মে নিয়োজিতদের প্রায় ৯ শতাংশ সপ্তাহে ২০ ঘন্টার কম কাজ করে। বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হলো এর বিরাট শ্রমশক্তি, যদিও এ শ্রমশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কর্মোপযোগী বয়সের জনগোষ্ঠী বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অনেকে মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ভুগে থাকেন যা থেকে উত্তরণ অত্যন্ত কঠিন। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়, বিশেষত দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও চর এলাকায়, সম্পদ বা বাজার ঘাটতিজনিত জমি বা আবাসন সঙ্কট। শিক্ষার নিম্নমান ও নিম্ন সাক্ষরতার হার তাদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অনেকে (প্রকৃতপক্ষে শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ) অনন্যোপায় হয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে দিনমজুরির কাজে (প্রধানত কৃষি খাতে) নিয়োজিত হয় এবং চরম দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া ছাড়া এসব পরিবার বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভাঙতে সক্ষম হবে না।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কর্মজীবী নারীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে কম (৩৬ বনাম ৮৩ শতাংশ)। নারীদের প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবারে তাদের দুর্বল অবস্থান (দর কষাকষি ক্ষমতা বিচারে) এর জন্য দায়ী। নারী কর্মীদের মজুরিও কম। একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষদের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম মজুরিও পেয়ে থাকে। এসব কারণ ছাড়াও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার কারণে শ্রমশক্তিতে কিশোরী মেয়েদের প্রবেশ ও টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, যা অল্পবয়সী সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে বিরাজমান দারিদ্র্যের উচ্চ স্তরকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। যদিও নারীরা পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান পাচ্ছে, তাদের অনেককেই সন্তান জন্মের পর চাকুরি ছেড়ে দিতে হয়।

একটি অপর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি পরিবারকে শিশুদের পাশাপাশি বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের দেখাশোনাও করতে হয়। কর্মজীবী পরিবারগুলির উপর এটি এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক কর, যা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের ফলে তাদের সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। নিজের ছেলেমেয়েদেরকে যে অর্থনৈতিক সহায়তা তারা দিতে পারতেন তা কমিয়ে দিতে দেয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধ বয়সে অবসরভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা যুক্তিসঙ্গত হারে প্রদান করা হয়, যা শিশুসন্তান বিশিষ্ট পরিবারগুলির চাহিদা মেটানো ছাড়াও কর্মজীবী পরিবারগুলিকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করে।

পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি কোনো গুরুত্বর রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। পরিবারগুলি সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ পরিবার দুর্বল স্বাস্থ্যকে অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদেরকে চিকিৎসা খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের উপার্জন থেকে নির্বাহ করতে হয়।

২.২.৫ প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধিতা জীবনের যেকোনো স্তরেই হতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৯ শতাংশ (৮ শতাংশ পুরুষ ও ৯.৩ শতাংশ নারী) প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তারা কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার হার মাত্র ১.৫ শতাংশ।[৫] চিত্র ২.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধিতার প্রকোপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে প্রতিবন্ধিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বয়স্কদের মধ্যেই প্রতিবন্ধিতার হার সবচেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার বেশি হয়ে থাকে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারে (৩১ শতাংশ) অন্তত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে এবং ৬.৩ শতাংশ পরিবারে কেউ না কেউ আছে যে মারাত্মক প্রতিবন্ধী।

চিত্র ২.৩: বয়স গ্রুপ ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার হার (২০১০)

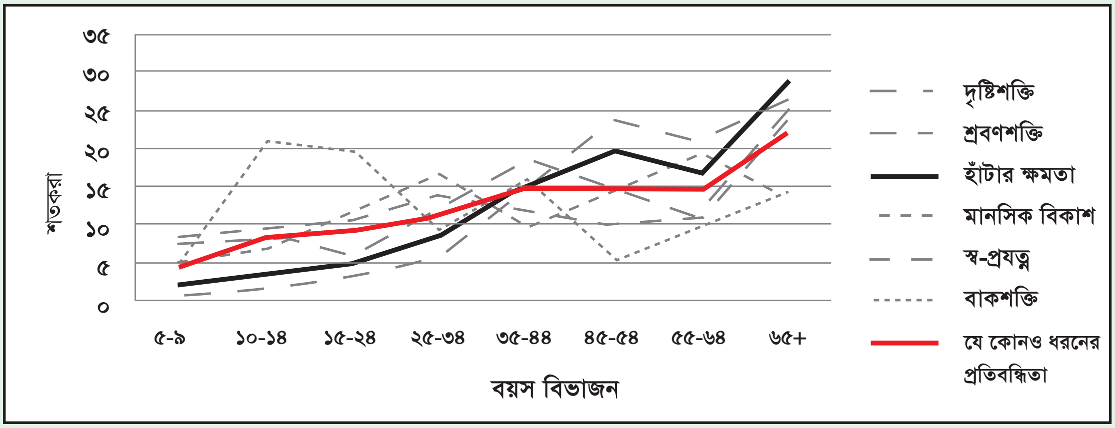

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

চিত্র ২.৪ -এ বয়স গ্রুপ ভেদে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরন দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, ৪০ থেকে ৬৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ; অথচ এ বয়সে তাদের শ্রমবাজারে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার কথা। বস্তুত, ২০-২৫ বয়স গ্রুপ থেকে ৫০-৫৪ বয়স গ্রুপে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; মহিলাদের মধ্যে এ হার পুরুষের চেয়ে বেশি। মারাত্মক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৬০ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের মধ্যে।

চিত্র ২.৪: প্রতি বয়সগ্রুপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা

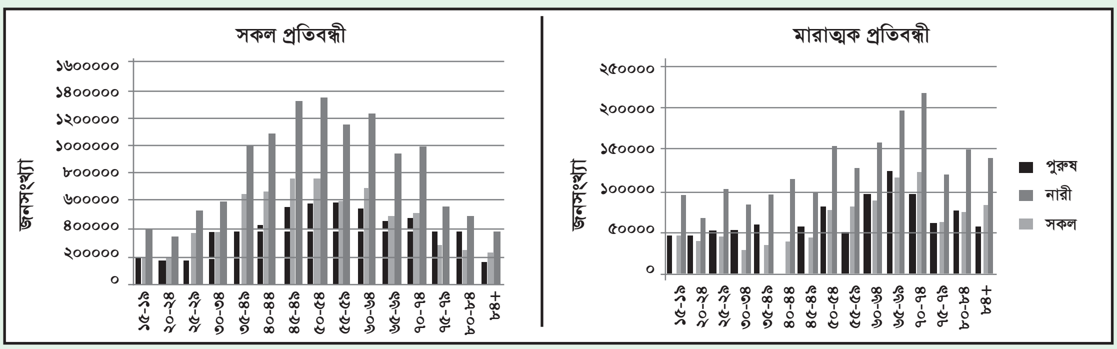

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন খানায় দারিদ্র্য হার জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্য হারের সমান অর্থাৎ ৩১.৫ শতাংশ, তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবারে দারিদ্র্য হার আরো বেশি, ৩৪.৭%, যা নির্দেশ করে যে প্রতিবন্ধিতা পরিবারসমূহের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়। অধিকন্তু, মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিভিন্ন বয়স গ্রুপে দারিদ্র্য হার ভিন্ন হয়ে থাকে (চিত্র ২.৫)। দেখা গেছে যে, পরিবারের কোনো কর্মক্ষম সদস্য অক্ষম হলে বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে পরিবারের উপর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তার প্রভাব পড়ে। বস্তুত, এই ধরনের পরিবারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪০ শতাংশ।

চিত্র ২.৫: প্রতিবন্ধিতার শিকার এমন পরিবারে দারিদ্র্যের হার, বয়স গ্রুপ ভেদে

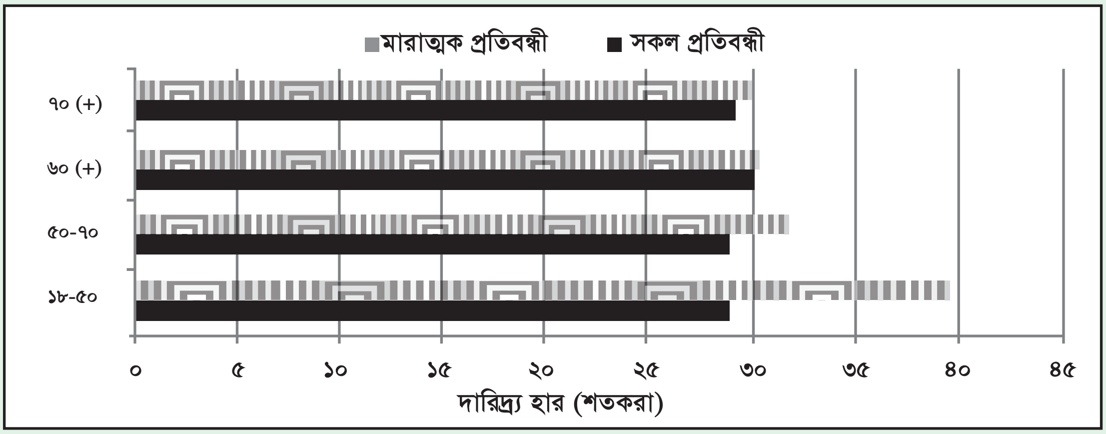

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

কর্মক্ষম বয়সে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে তা পরিবারের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে এমন লোকদের ৮৭ শতাংশ অক্ষম হয়ে পড়ার এক বছরের মধ্যে চাকরিচ্যুত হয়েছে। চাকুরি হারানোর সাথে সাথে তাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। অধিকন্তু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী পুরুষদের ৯০ শতাংশ পরিচর্যাকারীকে (প্রধানত তাদের স্ত্রী) সেবাযত্নের কাজে একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করতে হয়, যা তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ কমিয়ে দেয়। প্রায় ২৬ শতাংশ মহিলাকে সপ্তাহে ১৫ ঘন্টা সময় এবং ২৮ শতাংশকে ২৬ ঘন্টা সময় স্বামীর যত্ন নেয়ার জন্য দিতে হয়। এতে পরিচর্যাকারী মহিলাদের আয়ের ক্ষতি যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হতে পারে তেমনি তাদেরকে স্বাস্থ্যগত কারণে বাড়তি ব্যয় করতে হয়।

২.২.৬ বার্ধক্য

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব বয়সী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ এবং চিত্র ২.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে আগত দশকগুলিতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মোট জনসংখ্যায় বয়স্ক লোকের অংশ ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১২ শতাংশে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বয়স্ক ব্যক্তিদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি চিত্র ২.৭ ও ২.৮ -এ তুলে ধরা হয়েছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের প্রায় ২৮.২ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। তবে যখন দেশের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত অংশকে (১.২৫ গুণ উচ্চ দারিদ্র্যসীমা) বিবেচনায় নেয়া হয়, তখন দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য বয়স্ক লোকের অনুপাত ব্যাপক বৃদ্ধি পায় (চিত্র ২.৭)। অর্থাৎ অনেক বয়স্ক লোক দারিদ্র্যরেখার কাছাকাছি চলে আসছে এবং তাদের নিজেদের বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো সদস্যের জীবন-জীবিকা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির সম্মুখীন হলে তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যেতে পারে।

চিত্র ২.৬: ষাট ও তদুর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার অনুপাত

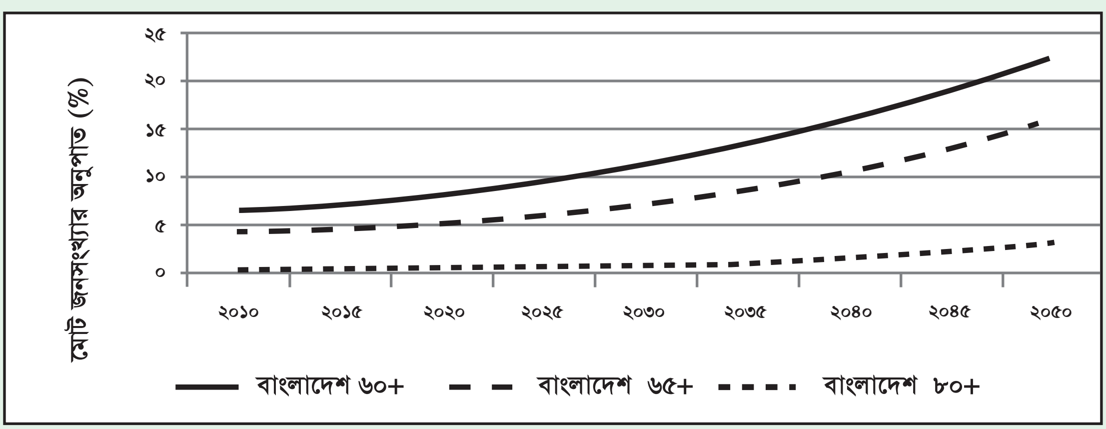

উৎস: ওয়ার্ল্ড পপ্যুলেশন প্রসপেক্ট: দ্য ২০১২ রিভিশন, ডিপার্টম্যান্ট অব ইকনমিক এন্ড স্যোশাল এফেয়ার্স অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস সেক্রেটারিয়েট, ইউএন পপ্যুলেশন ডিভিশন।

চিত্র ২.৭: দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত

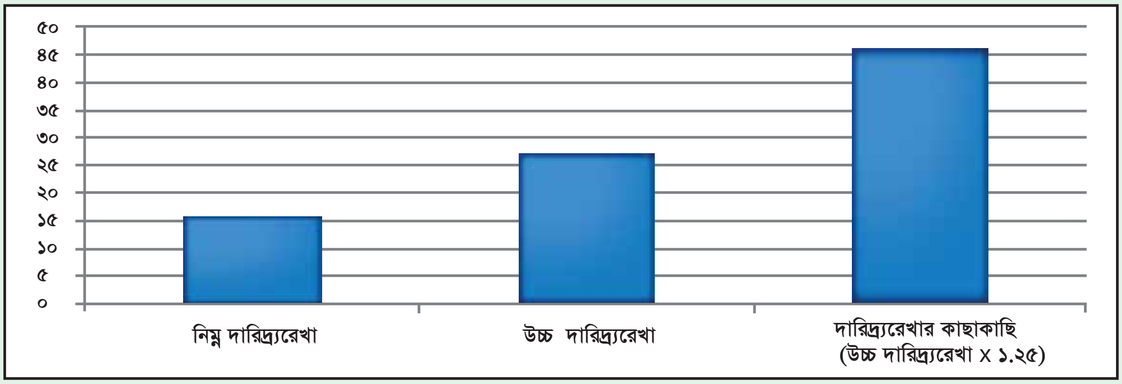

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

চিত্র ২.৮: বিভিন্ন বয়স গ্রুপের বয়স্ক মানুষের মাঝে দারিদ্র্যহার

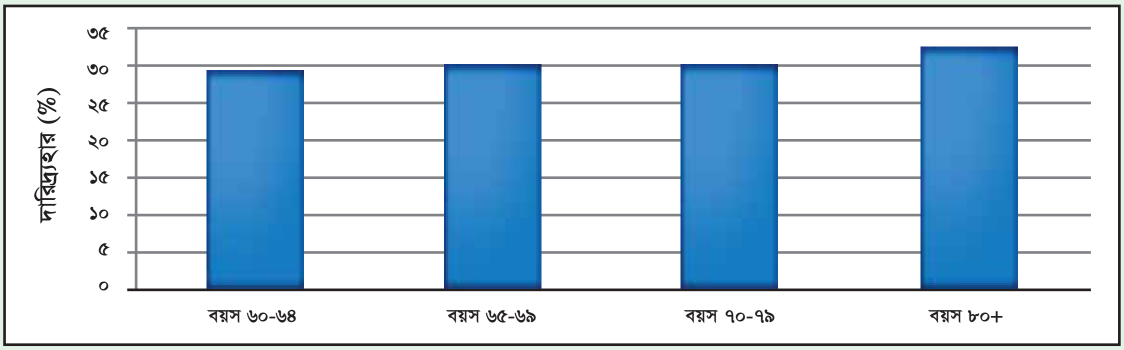

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস।

চিত্র ২.৮ -এ দেখা যাচ্ছে যে বয়োবৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধি পায়। কার্যকর বয়স্ক পেনশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক ব্যক্তিকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বয়স্ক মানুষেরা শ্রমবাজারে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগও খুব কম থাকে। একটি জরিপে দেখা গেছে, বয়স্ক ব্যক্তিদের মাত্র ১৯ শতাংশ ঋণ সুবিধা পায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেহেতু ক্রমশ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, সেহেতু কাজ করাটা তখন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনযাত্রার ব্যয়, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। কাজেই, বয়স্ক ব্যক্তিদের, বিশেষ করে যাদের বয়স আশির উপরে তাদের, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্যহার বেড়ে যাবার কারণ হলো তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া। তারা সাহায্য-সহায়তার জন্য ছেলেমেয়েদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং যদি তা না পায় তাহলে তাদেরকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হয়। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো এবং বয়স্ক লোকদের সাথে বাস করবে এমন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অনুপাত বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে এটি দারিদ্র্যহ্রাসে ভবিষ্যৎ অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে।

২.৩ সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দারিদ্র্য পরিস্থিতি

ধর্ম, বর্ণ, অসুস্থতা ও পেশা থেকে উৎসারিত স্থান বা সুনির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ গ্রুপের দারিদ্র্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

২.৩.১ নগর দরিদ্র

নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এখন একটি বৈশ্বিক ঘটনা। জাতিসংঘের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ শহর এলাকায় বাস করবে। এসব দেশের মধ্যে নগরায়নের সর্বোচ্চ হারে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা ছিল ২১ মিলিয়ন যা ২০১০ সালে দ্বিগুণ হয়ে ৪৩ মিলিয়নে দাঁড়ায়। নগর দারিদ্র্য প্রবণতা ও ধরনের উপরে দ্রুত নগরায়নের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে গত ২০ বছরে মাথাগুণতি অনুপাতে গ্রামীণ দারিদ্র্য অব্যাহতভাবে কমেছে, যদিও তা বিভিন্ন সময়ে কিছুটা বিভিন্ন হারে, তবে নগর দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ২.৯)। নগর দারিদ্র্য হার ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে দ্রুত হ্রাস পেলেও ২০০০ সালে পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে নগর দারিদ্র্য অব্যাহতভাবে কমেছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, ১৯৯১-৯২ ও ২০১০ সালের মধ্যে নগর দারিদ্র্যহার ৪২.৭ শতাংশ থেকে কমে ২১.৩ শতাংশ হয়েছে। তথাপি, দারিদ্র্যহারের ওঠানামা নগর দরিদ্রদের বিপদাপন্নতারই লক্ষণ।

গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামীণ দরিদ্রদের চেয়ে নগর দরিদ্রদের জীবন পরিস্থিতি সাধারণত খারাপ হয়ে থাকে। নগর দারিদ্র্য প্রায়শই বিশেষ কিছু উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন দিনমজুর বা কম মজুরির অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী হওয়া, বাসস্থান, মৌলিক ইউটিলিটি সেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব, নির্যাতনের শিকার হওয়া, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির শিকার হওয়া, দাবি দাওয়া তুলে ধরতে না পারা ও ক্ষমতাহীন হওয়া, দুর্বল সামাজিক বন্ধন থাকা ইত্যাদি। পর্যাপ্ত জীবিকায়ন ও বসবাসের পরিবেশ ছাড়াও নগর দরিদ্রদের সামাজিক সম্পদ সুরক্ষায় ভৌত ও মনো-সামাজিক নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ২.৯: নগর, গ্রামীণ ও জাতীয় দারিদ্র্যের ধারা (১৯৯১ - ২০১০)

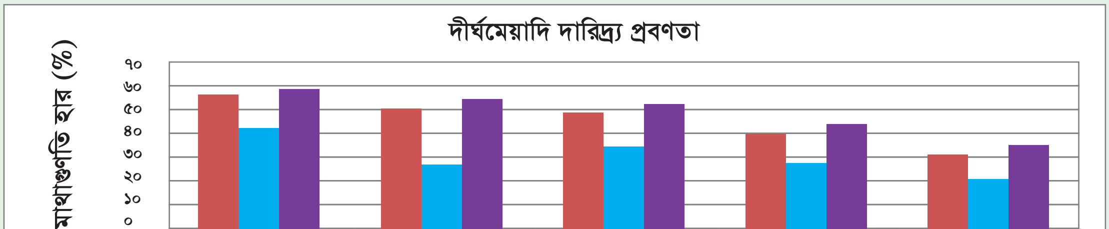

	১৯৯১-১৯৯২	১৯৯৫-১৯৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০
জাতীয়	৫৬.৭	৫০.১	৪৮.৯	৪০	৩১.৫
শহর	৪২.৮	২৭.৮	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩
গ্রাম	৫৮.৮	৩৪.৫	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২

উৎস: খানা ব্যয় জরিপ ১৯৯১-৯২ এবং খানা ব্যয়-ব্যয় জরিপ (বিভিন্ন বছর), বিবিএস।

২.৩.২ অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী

সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনার বিবিধ রূপ রয়েছে যেমন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়া, কর্মসংস্থান ও বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মূলধারার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া। এগুলো একত্রে প্রকট আকারের সমাজ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানিক মাত্রা লাভ করে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট বা বিশেষ এলাকায় আলাদা ধরনের প্রকাশ খুঁজে পায়) এবং এক বা একাধিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক সত্ত্বার উপাদানসমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের (পরিবার, গ্রাম ও কমিউনিটি এসোসিয়েশন সহ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কমকাণ্ডের ফলস্বরূপ এরূপ বৈষম্য ঘটতে পারে।

সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনা এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহ তাদের সমাজে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণসমূহ হলো: (ক) সামাজিক পরিচয় বা সত্ত্বা, যেমন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার ও বয়স; (খ) সামাজিক (বসবাসের) অবস্থান, যেমন দুর্গম এলাকা, কুখ্যাত এলাকা, যুদ্ধপীড়িত বা সংঘাতপূর্ণ এলাকা; (গ) সামাজিক মর্যাদা, এর অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি (প্রতিবন্ধিতা, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ও অন্যান্য ঘৃণিত রোগ-ব্যাধি), অভিবাসী অবস্থা (যেমন শরণার্থী), পেশা এবং শিক্ষার স্তর।

সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়, চা শ্রমিক, বেদে জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধিতার শিকার লোকজন, হিজড়া, গৃহহীন, ভিক্ষুক ইত্যাদি। এসব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বহির্ভূতির একটি সাধারণ ঘটনা হলো যেসব এলাকাতে রাষ্টের সেবাসমূহের অভাব রয়েছে বিধায় সামাজিক পরিষেবা অপরিহার্য সেসব এলাকাতে তারা সামাজিক সেবা-সহায়তা বলয়ের বাইরে থেকে যায়। এই বহির্ভূতির প্রভাব অনুভূত হয় অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং নৈতিক সমর্থন হারানো এ উভয় অর্থে। বহির্ভূতির অন্যান্য সাধারণ প্রকাশসমূহ হলো: কর্মসংস্থানের সুযোগে অসমতা, আনুষ্ঠানিক সেবাসমূহ যেমন স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন এবং ভূমি প্রাপ্তিতে অসমতা যেগুলিকে প্রায়শই ক্ষতিকর বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

নৃগোষ্ঠী: দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক কম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১.৫ মিলিয়নের বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১ শতাংশ। পাহাড়ি ও সমতল এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৪৫টি নৃগোষ্ঠী বাস করে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্টরা বাস করে চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়।

বাংলাদেশের সুপরিচিত নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা, গারো, মনিপুরি, মার্মা, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, খাসি, কুকি, ত্রিপুরা, ম্রো, হাজং ও রাখাইন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তিনটি প্রধান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত: বৌদ্ধ (৪৩.৭ শতাংশ), হিন্দু (২৪.১ শতাংশ) এবং খ্রিস্টান (১৩.২ শতাংশ)। এছাড়াও, অন্যান্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৯ শতাংশ।

গবেষণায় দেখা গেছে, পার্বত্য চট্রগ্রাম দেশের অন্যতম পশ্চাদপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। সকল পার্বত্যবাসীর মাত্র ৭.৮ শতাংশ প্রাথমিক এবং ২.৪ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য দারিদ্র্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই বছরের বেশিরভাগ সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকে। আষাঢ় (জুন-জুলাই) ও শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ চরম দরিদ্র (absolute poor) এবং ৪৪ শতাংশ হতদরিদ্র (hardcore poor)। । এছাড়া নিম্ন দারিদ্র্যরেখা ও উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৯ শতাংশ লোক। লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৭১ শতাংশ খানা নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে এবং লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৮৪ শতাংশ খানা উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠী: অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের মর্যাদা ঐতিহাসিকভাবে নিম্ন পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা সাধারণত অচ্ছুৎ ও অপয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। সুইপার, ডোম, মুচি প্রমুখ লোকদের নিয়েই অনগ্রসর জনগোষ্ঠী শ্রেণী গঠিত। বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বলতে সেসব পেশার লোককে বিবেচনা করা হয় যেগুলিকে অশুচি হিসেবে গণ্য করা হয় যেমন ঝাড়ু দেয়া, ড্রেন, নর্দমা পরিষ্কার করা, চা বাগানের শ্রমিকের কাজ, মৃতদেহ কবর দেয়া, জুতা ও চামড়ার কাজ, বাদ্য বাজানো, ধোপার কাজ ইত্যাদি। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করার উপায় হিসেবে সামাজিক বয়কট ও জবরদস্তিমূলক শ্রম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উপর জরিপভিত্তিক কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে কিছু অনুমিতি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৪.৫-৫.৫ মিলিয়ন অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাস করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো সমস্যাই মোকাবেলা করে না, বরং নিম্নোক্ত ধরনের চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হয়ে থাকে: (১) অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণা, (২) সামাজিক বহির্ভূতি, (৩) মর্যাদার অভাব, (৪) জীবিকাহীনতা, (৫) জমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ, (৬) সমাজে ও পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা, (৭) অজ্ঞতা ও তথ্যের অভাব, (৮) পরিবেশগত বিপর্যয়, (৯) আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অভাব এবং (১০) সরকারি সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির অভাব।

এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী: বাংলাদেশে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্তদের সংখ্যা ও এইডস রোগে মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। ২০১১ সালে নতুন শণাক্তকৃত ৪৪৫ জনসহ ইতোমধ্যে দেশে ২,৫৩৩ জন লোক এইচআইভি আক্রান্ত বলে শণাক্ত হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালে ২৫১ জন এইডস-এ আক্রান্ত হয় ও ৮৪ জনের মৃত্যু হয়। ফলে মোট এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ায় ১১০১ ও মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২৫। বাংলাদেশে পিএলএইচআইভি'র প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন কেননা নিম্ন হারের কারণে সাধারণ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বমূলক পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য উপাত্ত অনুসারে ২০১২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এইচআইভি নিয়ে বসবাসরত প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু-কিশোরের মোট সংখ্যা ৭,৭০০ (৪,৯০০-১৬,০০০)। আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি/এইডস -এর ব্যাপ্তি ১ শতাংশের চেয়ে কম।

বিভিন্ন নির্দেশক অনুসারে এইচআইভি/এইডস -এর ব্যাপ্তি বিবেচনায় বাংলাদেশের কিছু সফলতা আছে। দেশে এইচআইভি'র প্রকোপ এখনো অনেক কম। সাধারণ জনগণের মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার ০.১ শতাংশের নীচে, তবে সংক্রমিত (রিপোর্টেড) হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে কনডম ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে; ১৯৯০ সালে কনডম ব্যবহারের হার ছিল ৬.৩ শতাংশ যা ২০১০ সালে বেড়ে গিয়ে ৪৪-৬৭ শতাংশ হয়েছে।

এইচআইভির ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি ব্যাপক ও ভয়াবহ সমস্যা; এইচআইভি নিয়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ বিদেশ ফেরত। এইচআইভি নিয়ে বাস করা লোকদের অনেকেই বেকার যাদের আগে কাজ বা চাকুরী ছিল কিন্তু এখন নেই। শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি থাকায় এবং কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে তাদের অনেককে গ্রামে ফিরে যেতে হয়েছে। এইচআইভি আক্রান্তরা যদি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তাহলে তারা মানসম্মত এইচআইভি চিকিৎসা ও পরিচর্যার সুফল পাবেনা। এইচআইভিতে আক্রান্ত লোকদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী সিডি৪ এর পরিমাণ কমায়, এর ফলে এইচআইভি সংশ্লিষ্ট উপসর্গসমূহ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত সামাজিকভাবে বঞ্চিত হয়, কারণ এ ধরনের অসুস্থতা বা রোগব্যাধি সামাজিক লজ্জার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু, আক্রান্ত মহিলা ও শিশু-কিশোরেরা স্বামী বা বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তারা সুবিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের বিপদাপন্নতা বা ঝুঁকির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

পিতা/মাতার এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড থাকার কারণে এতিম সন্তানেরাও নানা ধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। অভিযোগ বা নালিশ দায়েরের ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্তরা যেসব প্রধান বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তা হলো সংক্রমিত হওয়ার কথা প্রকাশ করে দেয়া বা বৈষম্য/বঞ্চনার ভয়, যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন, আর্থিক সংকট, এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অভাব ইত্যাদি।

বিধবা ও দুস্থ মহিলা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলারা দেশের মোট বিবাহিত নারীর ১১.৩ শতাংশ। সমাজের চোখে একজন বিধবা সবসময় বোঝা হিসেবেই গণ্য হয় এবং সেজন্য উপেক্ষিতও বটে। পরিবার ও সমাজে একজন বিধবার কোনো সম্মান থাকে না, বিশেষ করে দরিদ্র সমাজে একজন বিধবার নিজস্ব কোনো পছন্দ থাকে না, এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও থাকেনা। অথচ পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত। বিশেষত গ্রামীণ নারীদের বেশিরভাগই গৃহিণী এবং তাদের স্বামীরাই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

বিধবা হওয়ার বিরূপ অর্থনৈতিক পরিণতি ছাড়াও এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও রয়েছে। দুস্থ মহিলাদের মধ্যে যারা তালাকপ্রাপ্ত বা বয়োবৃদ্ধ এবং যাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে তারা সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারগুলোতে বৃদ্ধদেরকে বিশেষ করে বৃদ্ধ মহিলাদেরকে বোঝা হিসেবে গণ্য হয় এবং তাদের অনেককে বাড়ি বা ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত আয় বা উপার্জন করতে পারে না বিধায় তারা পরিবার থেকে প্রায়শই সাহায্য-সহায়তা পায় না।

২.৪ ঝুঁকি মোকাবেলা: স্বকীয় এবং যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ও অভিঘাত

বাংলাদেশের পরিবারসমূহ একাধিক স্বতন্ত্র বা স্বকীয় অভিঘাতের সম্মুখীন হয় যেমন স্বাস্থ্যগত আঘাত (অসুস্থতা/জখম), কর্ম হারানো ও সম্পদ হারানো। তারা আবার অনেক যৌথ (সর্বব্যাপী বা কমিউনিটি পর্যায়ের) অভিঘাতও মোকাবেলা করে থাকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট ও বিশ্ব মন্দা। ১৯৯৭-২০০৬/০৭ সময়কালে বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি পরিবার বিভিন্ন অভিঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফলে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত অভিঘাত হিসেবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভিঘাতসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে (২৪-৪৪ শতাংশ খানা কর্তৃক রিপোর্টেড)। বেশিবার সংঘটিত অন্যান্য অভিঘাত হলো হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর মৃত্যু (২১ শতাংশ), পরিবেশ ও জলবায়ুজনিত অভিঘাত (১৫-১৮ শতাংশ), এবং বিবাহের যৌতুক হিসেবে ব্যয়জনিত (কোনো কোনো সমীক্ষা মতে ২৩ শতাংশ)।[৬] সর্বাপেক্ষা বেশি যৌথ অভিঘাত আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এবং এ দুর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে।

অভিঘাতের প্রকৃতি, সংঘটনের সংখ্যা ও মাত্রা/তীব্রতা এবং পরিবার বা খানার প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভর করে পরিবারসমূহের জন্য অভিঘাতের পরিণতি এবং এসব অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের সামর্থ্য । প্রামাণ্য তথ্য থেকে দেখা যায় ব্যক্তি বা খানা পর্যায়ের অভিঘাত হতে কমিউনিটি পর্যায়ের অভিঘাতের প্রভাব ভিন্ন ধরনের। স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং কম জমি ও সম্পদের মালিকানা বিশিষ্ট খানাসমূহর উপর অভিঘাতসমূহের প্রভাব অনেক বেশি মারাত্মক।

অভিঘাত ও এদের প্রভাব মোকাবেলার জন্য খানাসমূহ বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে। অভিঘাত মোকাবেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো সঞ্চয়কে কাজে লাগানো। প্রায় ৩৪ শতাংশ খানা সঞ্চয়কে কাজে লাগানোর কথা বলেছে। স্বচ্ছল পরিবারগুলো তাদের সঞ্চয়, অল্প সুদে ঋণ, কম দামে সম্পদ বিক্রি এবং বিলাস দ্রব্যাদির ভোগ কমানো ইত্যাদি উপায়ে অভিঘাত মোকাবেলা করে। পক্ষান্তরে, অসচ্ছল পরিবারসমূহের একটি বৃহৎ অংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক দ্রব্যাদির ভোগ কমিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ও উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে অভিঘাত মোকাবেলা করে। উচ্চ সুদের ঋণ গ্রহণ দরিদ্র খানাগুলোকে আরো শোচনীয় ও বিপর্যস্ত করে তোলে।

২.৪.১ মৌসুমী দারিদ্র্য

গ্রামীণ বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের তিন ধরনের ধান ফসল উৎপাদনের তিনটি প্রধান শস্যপর্যায়ের উপর ভিত্তি করে আয়, ভোগ ও দারিদ্র্যের মৌসুমভিত্তিক পার্থক্য একটি পৌনঃপুনিক বিষয়। বোরো ধান উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি, অশস্য কৃষির প্রসার, গ্রামীণ অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের প্রসার এবং কৃষি শ্রমিকদের মৌসুমী অভিগমন দেশের অনেক এলাকায় আয় ও ভোগ বাড়াতে সহায়তা করেছে। তথাপি এখনও অনেক এলাকা, বিশেষ করে রংপুর বিভাগে, মৌসুমভিত্তিক দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে।

আমন ফসল উঠার আগের তিন মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এই মৌসুমী দারিদ্র্যের ঘটনা ঘটে থাকে। ঋতুনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট মৌসুমী খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রায়শই তীব্রতর হয় বিশেষত বিরূপ আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলে অর্থাৎ ভাল ফলন না হলে। কৃষির ঋতু নির্ভরতা ছাড়াও কৃষি-জলবায়ু ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত পার্থক্য এবং স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্য (রংপুর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়) আয় ও ভোগের মৌসুম নির্ভরতাকে প্রভাবিত করে। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে মৌসুমী পার্থক্য, মন্দা/দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ইলিশ মাছ আহরণে দুই মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি কারণে জেলে সম্প্রদায় মৌসুমী বেকারত্বের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

২.৪.২ খাদ্যমূল্যজনিত অভিঘাত

খাদ্য মূল্যের বার্ষিক ওঠানামা, বিশেষ করে প্রধান খাদ্যশস্য ধানের ক্ষেত্রে, ফলন বিপর্যয়ের কারণে হয়ে থাকে এবং এটি একটি নিয়মিত ঘটনা। যদি অভ্যন্তরীণ ফসল উৎপাদন কম হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববাজারে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় তবে তা সংকটপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়। সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৮ সালের প্রথম চার মাসে এবং ২০১০ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১২ সালের প্রথমদিক পর্যন্ত সময়কালে বিশ্ব খাদ্যমূল্য চরম বৃদ্ধি পায়। ২০০৫ ও ২০০৮ সালের মধ্যে চালের মূল্য ২৫ শতাংশ, গমের মূল্য ৭০ শতাংশ এবং ভূট্টার মূল্য ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সালের প্রথম চার মাসে পরিলক্ষিত হওয়া আকস্মিক খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে দেশের জনগণের জীবন জীবিকায় ও কল্যাণে। কারণ বাংলাদেশ খাদ্য আমদানিকারক দেশ এবং পরিবারসমূহের আয়ের একটি বড় অংশ খাবারের পেছনে খরচ হয়। উদাহরণ স্বরূপ দারিদ্র্য বিভাজনের সর্বনিম্ন ধাপে (কুইন্টাইল বা পঞ্চমাংশে) অবস্থিত খানাসমূহে (২৩ শতাংশ) পারিবারিক ভোগের ৪০ শতাংশ হলো চাল।

খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সব পরিবারের উপর একরকম নয়। স্বল্প মেয়াদে, যেসব দরিদ্র লোক তাদের আয়ের বড় অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্যমমেয়াদে, যখন বর্ধিত খাদ্যমূল্যর সাথে মজুরিকে সমন্বয় করা হয় তখন খানাসমূহ সমভাবে প্রভাবিত হয়। দীর্ঘমেয়াদে, যখন অন্য খাতের উপর খাদ্যমূল্যেরও পরোক্ষ উদ্বৃত্তি (স্পিলওভার) প্রভাব থাকে তখন উচ্চ আয় গ্রুপের পরিবারসমূহ দরিদ্রদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেননা তারা সেবা উৎপাদনের বড় অংশ ভোগ করে।

২.৪.৩ অর্থনৈতিক মন্দা

বাণিজ্যচক্রের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ে যা লেখা আছে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাদির কারণে বাংলাদেশে তার দৃষ্টান্ত বিরল। যেহেতু বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে শিল্পায়িত হচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর বৈশ্বিক উত্থান-পতন এর প্রভাব মারাত্মক হতে পারে এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব হতে পারে গভীর। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৯৭-৯৮ সালে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সংঘটিত আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এ ধরনের সংকটকালে সাধারণত বেকারত্ব বেড়ে যায় এবং প্রকৃত মজুরি কমে যায়।

২.৫ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকির বিপরীতে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের ম্যাপিং

১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি অতি ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে। তখন দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। কিন্তু প্রায় ৪০ বছরে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে; তথ্য-উপাত্ত এ কথাই বলছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৩.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। নব্বই দশকের প্রথমদিকে সারাদেশ ভয়াবহ ও ব্যাপক বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সামাজিক সুরক্ষা হাতিয়ার, যেমন ভিজিএফ কার্ড ও মহামারি প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ওআরএস এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এমন মাত্রায় অগ্রসর হয়েছিল যে সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্জাগরিত করতে সক্ষম হতো। একটি বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দুর্যোগ পরবর্তী মৃত্যু ও খাদ্যাভাবের মাধ্যমিক চক্রকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত প্রাকৃতিক দুর্যোগে করুণার পাত্র হয়ে থাকার যে নিয়তি নির্ধারিত ভাবমূর্তি বাংলাদেশের ছিল সে দুর্নাম মুছে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২.৫.১ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থান

সারণি ২.১ এ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও ঝুঁকির বিপরীতে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের বর্তমান সংস্থান অধিকতর বিস্তারিতভাবে নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের দুর্বল ও সবল দিকসমূহও যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

২.৫.২ প্রাক-শৈশবকাল

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে অতি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সামান্য যদিও তারা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে, বিশেষ করে পুষ্টিহীনতার ক্ষেত্রে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে স্বল্প পরিমাণের শিশু অনুদান দেয়, তা দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচি নামে পরিচিত। দেশের মাত্র এক লাখ পরিবার এ ভাতা পেয়ে থাকে। কাজেই, শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থানে যে ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাপক। বস্তুত, প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা পায় না। এ বিরাট ঘাটতি পূরণ করা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের জন্য একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

সারণি ২.১: জীবনচক্র অনুযায়ী সাজানো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

কর্মসূচির নাম	বাজেট বরাদ্দ মিলিয়ন টাকায়	কভারেজ ব্যক্তির সংখ্যা (লাখ)	জীবনচক্র পর্যায়ের বাজেট	মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের %	মোট উপকারভোগী (লাখ)	মোট এসএস উপকারভোগীর %
২০১৩ অর্থবছরে মোট এসএস বাজেট (মিলিয়ন টাকায়)	২৩০,৯৭০					
মোট উপকারভোগী (০০,০০০)		৭৭৬				
জীবনচক্র পর্যায়: গর্ভধারণ কাল ও প্রারম্ভিক শৈশবকাল			৫,৩৫৭	২.৩২%	৫.৬৭	০.৭৩%
মাতৃ, শিশু, প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্য	১,৩৯০	০.৬৭				
কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩,৯৬৭	৫.০				
জীবনচক্র পর্যায়: বিদ্যালয় গমনের বয়সকাল			২০,২৯০	৮.৭৮%	১৪০.৪	১৮.০৯%
প্রাথমিক শিক্ষা উপ-বৃত্তি	৯,২৫০	৭৮.১৭				
স্কুল ফিডিং প্রোগাম এবং দরিদ্রপ্রবণ এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	৪,৫৬৫	২৪.৪				
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড ও প্রবেশ বৃদ্ধি	৬,৪৭৫	৩৭.৮৩				
জীবনচক্র পর্যায়: কর্মক্ষম বয়স			৫৪,৩৯৮	২৩.৫৫%	১০৩.৭	১৩.৩৬%
বিধবা, অসহায় ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা	৩,৩১২	৯.২				
দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (ইইপি)	১,১০৪	৪০.১				
পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য খাদ্য সহায়তা	২,৪২৩	৩.৫৭				
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি	১২,০০০	০.৪২				
ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট	৮,৫৮৯	২২.৬				
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	১৪,৯২৭	১৬.৭				
সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	২,৮৮৭	-				
পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি	২,৫৭৫	১.৩৩				
একটি বাড়ী একটি খামার	৫,৩৮০	৯.৬৭				
আশ্রয়ণ ২ প্রকল্প	১,২০১	০.১১				
জীবনচক্র পর্যায়: বার্ধক্য/ বৃদ্ধ বয়স			৭০,১১৮	৩০.৩৬%	৩০.৫২	৩.৯৩%
ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ	২,২৮০	০.২৯				
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী প্রদান	৩,৬০০	১.৫				
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি ও তাদের পরিবারের জন্য পেনশন	৫৫,৩২৮	৩.৯৮				
বয়স্ক ভাতা	৮,৯১০	২৪.৭৫				
প্রতিবন্ধিতা			১,০৩০	০.৪৫%	২.৮৬	০.৩৭%
আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১,০৩০	২.৮৬				
সাধারণ উদ্দেশ্য			১৬,১১৯	৬.৯৮%	১০.৪১	১.৩৪%
জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল	৪,০০০	৯.০				
ন্যাশনাল সার্ভিস	৩,১০৮	০.৪১				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য থোক বরাদ্দ	১,০০০	-				
বিবিধ কর্মসূচির জন্য থোক বরাদ্দ	৮,০১১	১.০				

কর্মসূচির নাম	বাজেট বরাদ্দ মিলিয়ন টাকায়	কভারেজ ব্যক্তির সংখ্যা (লাখ)	জীবনচক্র পর্যায়ের বাজেট	মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের %	মোট উপকারভোগী (লাখ)	মোট এসএস উপকারভোগীর %
খাদ্য সহায়তা			৪৪,৭৮৭	১৯.৩৯%	৩৯৮.৬৩	৫১.৩৭%
ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং	১২,০০৮	৮৫				
টেস্ট রিলিফ (টিআর) খাদ্য	১২,৬০২	১৩				
গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর) খাদ্য	২,৫৯৬	৮০				
খোলা বাজারে বিক্রি (ওএমএস)	১৭,৫৮০	২২০.৬৩				
অন্যান্য			১৮,৮০০	৮.১৪%	৮৩.৬১	১০.৭৭%

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৫.৩ স্কুলগামী ছেলেমেয়ে

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপ-বৃত্তি কর্মসূচিতে। প্রায় ১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী এ বৃত্তি সুবিধা পেয়ে থাকে। তবে, সুবিধাভোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের প্রায় ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে উপ-বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সামান্য অনুদানের ব্যবস্থা আছে; মাত্র ১৮,৬০০ প্রতিবন্ধী শিশু এ সুবিধার আওতাভুক্ত। উপ-বৃত্তির টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য। একজন ছাত্র প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে পায়। তবে, কোনো পরিবারে দুজন উপ-বৃত্তি গ্রহণকারী থাকলে সেক্ষেত্রে দুজনে মিলে মোট ১২৫ টাকা পায়। সুতরাং শিক্ষার্থী প্রতি উপ-বৃত্তির পরিমাণ ১০০ টাকার চেয়ে অনেক কম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বয়সের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী প্রতি ১২০ থেকে ১৫০ টাকা উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যদি এক পরিবার থেকে দুজন উপ-বৃত্তিগ্রহীতা থাকে তবে শিক্ষার্থী প্রতি টাকার পরিমাণ কমে যায়। চিত্র ২.১০ এ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রদত্ত অনুদানের সাথে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদেরকে প্রদত্ত অনুদানের তুলনা করা হয়েছে (মাথাপিছু জিডিপির শতকরা হার হিসেবে)। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে প্রদত্ত অনুদানের (চিত্রে নীল রঙ এর বার দুটি দ্বারা দেখানো হয়েছে) পরিমাণ ব্রাজিল ছাড়া বেশিরভাগ দেশের চেয়ে কম। যদি একের অধিক শিশু শিক্ষার্থী আছে এমন পরিবারের উপ-বৃত্তির টাকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থী প্রতি বৃত্তির প্রকৃত পরিমাণকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী টাকার পরিমাণ এমনকি ব্রাজিলের চেয়েও কম হবে যেখানে পরিবারসমূহ একাধিক সুবিধা পেয়ে থাকে।

চিত্র ২.১০ অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে উপ-বৃত্তির পরিমাণ

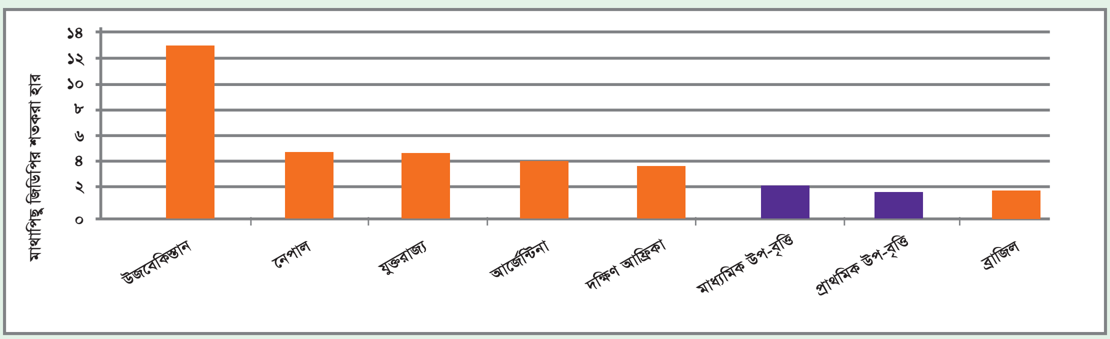

উৎস: সংযুক্তি ১. পটভূমিপত্র নং ৮

উপ-বৃত্তির জন্য শিশুদের অন্তর্ভুক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের অন্তর্ভুক্তি অতি সামান্য। দেশের ঠিক কতসংখ্যক শিশু প্রতিবন্ধী তা জানা সম্ভব নয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ০-১৮ বয়স গ্রুপের প্রতিবন্ধী শিশুদের অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে, যা কেয়ার ডিপেনডেন্সি গ্রান্ট নামে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সকল শিশুর ০.৬ শতাংশ এ অনুদান সেবা পায়। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করতে যদি একই হার (০.৬%) ব্যবহার করা হয় তাহলে দেশের মোট অনুমিত প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা হবে ৩৫০,০০০। সুতরাং বর্তমানে প্রতিবন্ধী শিশুদের কভারেজ মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জনপ্রতি অনুদানের পরিমাণ বা আকার;

এটি কোনো অর্থপূর্ণ বা কার্যকর প্রভাব রাখার জন্য খুবই ক্ষুদ্র। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অনুদান আকার হওয়া উচিত যা হতে হবে মাথাপিছু জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশের সমান, অর্থাৎ প্রতি মাসে ২৪০ টাকা (একের অধিক সন্তান আছে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে টাকার অংক না কমিয়ে)। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পুষ্টি। স্কুলে দুপুরের খাবার কর্মসূচিতে শিশুদের পুষ্টির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

২.৫.৪ কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠী (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ)

কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য ১০টি সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে (সারণি ২.১)। এ ১০টি কর্মসূচিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচি ও নারীদের জন্য কর্মসূচি।

দেশে মোট আট ধরনের কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচি আছে এবং এর মধ্যে দুটি বৃহৎ কর্মসূচি হলো- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি এবং অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য হলো কৃষি খাতে কর্মহীন সময়ে গ্রাম এলাকায় যাদের কাজের খুব প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নারীদের জন্য। এ ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা। এসব কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা হয়। এ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৫ বিলিয়ন টাকা (সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়িত মোট ব্যয়ের ১৪ শতাংশ) বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে এসব সম্পদ ব্যবহারের কার্যকারিতা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। সরকার এসব বিষয়ে সজাগ রয়েছে এবং এগুলির সমাধানে পদক্ষেপ নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীন বিভিন্ন খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচির দক্ষতা উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে: খাদ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অনুদান প্রদান এবং এমআইএস এর ব্যবহার ও এর উন্নতিসাধন। কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত অন্য কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে নারীদেরকে লক্ষ্য করে। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ কর্মসূচি হলো বিধবা ভাতা। প্রায় ১ মিলিয়নের বেশি মহিলা এ কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেয়ে থাকে এবং এ সুবিধাভোগীদের প্রায় ২৩ শতাংশের বয়স ৬২ বছরের উপরে। এ কর্মসূচিতে প্রত্যেক উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়, যা বার্ষিক অনুদান হিসেবে মাথাপিছু জিডিপির প্রায় ৫.৫ শতাংশের সমপরিমাণ। তবে এ হার নেপালে প্রচলিত একই ধরনের মহিলা ভাতা কর্মসূচিতে প্রদত্ত হারের চেয়ে অনেক কম। নেপালে এ হার মাথাপিছু জিডিপির ১১ শতাংশ।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচিতে প্রত্যেক উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্যশস্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পরিবারগুলোর কাছে এ সহায়তার যথেষ্ট মূল্য আছে কেননা এ ভাতা মাসে ৯০০ টাকার সমপরিমাণ।[৭] ক্ষুদ্রব্যবসা গড়ে তোলার জন্য নারীরা সহায়তা পেয়ে থাকে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.২ মিলিয়ন নারী উপকৃত হচ্ছে।

কর্মক্ষম বয়সী নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ হচ্ছে (যদিও নগদ অর্থ সহায়তা নয়) মায়েদের অল্পবয়সী শিশুদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, যা কর্মজীবী মায়েদেরকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে। বাংলাদেশে শিশু প্রযত্নের সুবিধা খুবই সীমিত। দেশের অল্পসংখ্যক কলকারখানাতে কর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য দেখাশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু শিশু সেবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করে, যা প্রধানত ঢাকা শহরে অবস্থিত।

২.৫.৫ কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বাদ পড়া কর্মসূচিসমূহ

আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দুটি বাদ পড়া ক্ষেত্র হলো বেকারত্ব বিমা এবং দুর্ঘটনাজনিত বিমা। তৈরি পোশাক শিল্পে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ও ভবন ধসের কারণে দুর্ঘটনাজনিত বিমার গুরুত্ব অনুধাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু উৎপাদনখাতে এবং সংগঠিত সেবাখাতে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু এ দুটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে মোট শ্রমশক্তির ৮৭.৫ শতাংশ নিয়োজিত।[৮] সেখানেও সামাজিক বিমার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার করে কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার।

২.৫.৬ বয়স্কদের জন্য কর্মসূচি

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেসব কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ব্যয় হয় যেগুলি বৃদ্ধ বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি। তবে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা মাত্র ৩৯৮,০০০ জন। সরকারি পেনশনের সুবিধা সচ্ছল পরিবারগুলিই বেশি পেয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বয়স্ক ভাতার আওতা বেড়েছে এবং ২.৫ মিলিয়ন মানুষ বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাচ্ছে। অধিকন্তু, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের যে ভাতা দেয়া হয় তা প্রধানত বয়স্ক লোকদেরই দেয়া হয় এবং বিধবা ভাতা গ্রহীতাদেরও অনেকেই বয়স্ক।

[৭] সহায়তার পরিমাপ অনুমান করে পরিমাপ করা হয়েছে যে উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ৩০ কেজি খাদ্যশস্য (চাল/গম) উপকারভোগীরা বাজার থেকে ক্রয় করতে প্রতি কেজি ৩০ টাকা দাম পড়বে। সরকারের কাছে এর প্রকৃত মূল্য আরও কম হবে।

[৮] বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স/ স্ট্যাটিসটিক্স এ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন।

বয়স্কদের জন্য পেনশন কর্মসূচির আওতায় আছে ৬৫ উর্ধ্ব বয়সের পুরুষদের ৩৫ শতাংশ এবং ৬৩ উর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের ৪০ শতাংশ। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির উপকারভোগীদের ৩৩ শতাংশের বয়স ভাতা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার নীচে রয়েছে। ফলে পেনশনের আওতা প্রকৃতপক্ষে ৩০ শতাংশের নীচে।

চিত্র ২.১১: অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের স্কীমের সাথে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার পরিমাণের তুলনা

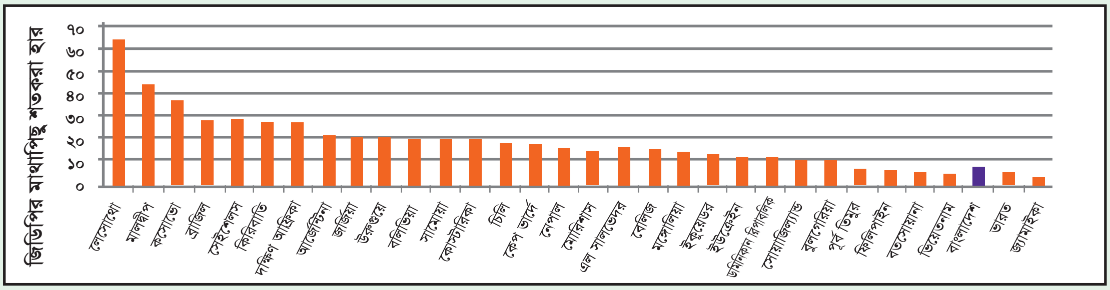

উৎস: Pension Watch Database

বয়স্ক ভাতা হচ্ছে প্রধান পেনশন কর্মসূচি কিন্তু এ কর্মসূচির আওতায় ৩০০ টাকা নগদ সহায়তা পরিমাণে খুবই অপ্রতুল এবং তা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে কর্মসূচির সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। চিত্র ২.১১ -এ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের সরকার অর্থায়িত কর্মসূচিতে প্রদত্ত ভাতার সাথে বাংলাদেশের বয়স্ক ভাতার পরিমাণের তুলনা করা হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান বয়স্ক ভাতার পরিমাণের দিক দিয়ে বিশ্বে সবচেয়ে কম ভাতা প্রদানকারী দেশগুলির একটি যার পরিমাণ এমনকি নেপালের সিনিয়র সিটিজেন ভাতার পরিমাণের চেয়েও কম।

২.৬ যৌথ ঝুঁকি প্রশমনে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ

১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও বন্যার ফলস্বরূপ বেশ কিছু খাদ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উদ্ভব হয়। এসব কর্মসূচির লক্ষ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অভিঘাত, যেমন খাদ্য মূল্য সংকট, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উত্থান-পতন বা মন্দা ইত্যাদি কারণে সংঘটিত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এছাড়া এসব কর্মসূচির লক্ষ ছিল মৌসুমী বেকারত্ব থেকে সৃষ্ট দারিদ্র্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করা।

২.৬.১ দুর্যোগজনিত ঝুঁকি প্রশমনমূলক কর্মসূচিসমূহ

দুর্যোগজনিত ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচিসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। এসব কর্মসূচির মোট সংখ্যা ও বরাদ্দকৃত বাজেট সারণি ২.২ এ দেখানো হয়েছে। দুর্যোগজনিত ঝুঁকি প্রশমন ও হ্রাসমূলক কর্মসূচিসমূহের প্রধান লক্ষ্য হলো ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে দুর্যোগের শিকার জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করা। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সাধারণত ছোট অংকের হয়ে থাকে (৫০০০ টাকা থেকে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত), যা সামান্য সার্ভিস চার্জে ০১ থেকে ০৩ বছরের জন্য দেয়া হয়। এ ঋণ সুবিধাভোগীর সংখ্যা এক মিলিয়নের বেশি।

সারণি ২.২: দুর্যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আওতা এবং বাজেট বরাদ্দ

কর্মসূচির নাম	কভারেজ (লাখ জন/মাস)		বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	
	অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১১-১২	অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১১-১২
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রশমন	২.১২	১.৬১	১৭.১২	১৩.০০
ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং	১২২.২২	১০৪.৪৪	১৪৭৩.৬৪	১৬০৭.১৫
গ্রাটুইটাস রিলিফ	৮০.০০	৮০.০০	২৬৩.৭৬	২৭৩.৫৬
জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল	১৭.০০	১৭.০০	৭০০.০০	৭০০.০০
আইলা আক্রান্ত পল্লী অবকাঠামো সংস্কার	-	০.০৬	-	২৪.০০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় বাজেট, অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত) এবং অর্থবছর ২০১১-১২।

১৯৯৮ সালের ধ্বংসাত্মক বন্যার প্রতি সাড়া দিতে গিয়ে বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দুঃখ-কষ্ট প্রশমনে সরকার দুটি প্রত্যক্ষ অনুদানমূলক ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এসকল পরিবারকে গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর) কর্মসূচির আওতায় তাৎক্ষণিক ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর অক্টোবরের শেষ দিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে গৃহীতভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কর্মসূচি শুরু করা হয়। এ দুটি কর্মসূচিতে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা কম হওয়া, সুবিধাভোগী হবার যোগ্য নয় এমন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের অন্তর্ভুক্তি এবং গড় সুবিধার মূল্যমান কম হওয়া ইত্যাদি কারণে এসব কর্মসূচির মূল্যায়ন থেকে মিশ্র ফলাফল পাওয়া যায়। যাহোক, এ দুটি কর্মসূচি যেকোনো বড় ধরনের খাদ্য সংকট পরিহারে সহায়তা করেছে।

এ দুটি কর্মসূচি ছাড়াও আরও দুটি সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক তহবিল রয়েছে। একটি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং অন্যটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল।

মৌসুমী বেকারত্ব সমস্যা মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ: মৌসুমী বেকারত্ব এবং খাদ্য মূল্য বৃদ্ধিজনিত অভিঘাতজাত ঝুঁকি প্রশমনে নানা ধরনের কর্মসূচি চালু রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) এবং কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), যা মৌসুমী দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে আক্রান্ত পরিবারসমূহকে দ্রুত ও জরুরি সহায়তা প্রদান করে। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিসমূহ হলো: অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি), টেস্ট রিলিফ ইত্যাদি। এছাড়া খাদ্য সহায়তামূলক কর্মসূচিও রয়েছে। যেমন- ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) ও ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি। এনজিও ও সরকার উভয় পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের এক যৌথ মূল্যায়ন থেকে দেখা গেছে, মৌসুম ভিত্তিক দারিদ্র্য হ্রাসের উপর এসব কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তবে নানাবিধ কারণে এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মৌসুমী খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্য মোকাবেলা করার সর্বাপেক্ষা টেকসই উপায় হলো অবকাঠামোতে বিনিয়োগ ও অকৃষিজ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রংপুর বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এছাড়া, উন্নত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে দরিদ্র জনগণের আরও বেশি প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

খাদ্যমূল্যজনিত অভিঘাতের প্রতি সরকারের সাড়াদান: এক্ষেত্রে সরকার বিদ্যমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ বৃদ্ধি করেছে। নতুন নগদ অর্থভিত্তিক ওয়ার্কফেয়ার কর্মসূচি ও ইজিপিপি ২০০৯ সালে চালু হয়। নগর এলাকায় ওএমএস কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হয়। নানাবিধ প্রশাসনিক সমস্যা সত্ত্বেও এসব কর্মসূচি খাদ্যমূল্য অভিঘাতের প্রভাবকে সহনীয় রাখতে সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো- কোনো সংকট বা ঝুঁকির প্রতি সরকারের সময়োচিত সাড়াদান এবং সমাজের দরিদ্রতম অংশ যাদের সাহায্য বেশি প্রয়োজন তাদেরকে টার্গেট করা।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা: অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সরকারের নানা ধরনের রাজস্ব ও আর্থিক নীতি হাতিয়ার রয়েছে। সরকার স্বীকার করে যে কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে কিছু সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। বেকারত্ব বিমাকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা প্রসারিত করে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি সম্পর্কিত সরকারি নীতি ছাড়াও একটি অধিকতর লক্ষ্যভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হতে পারে অর্থনৈতিক মন্দাজনিত ঝুঁকিসমূহ প্রশমনে সম্ভাব্য সাড়াদানের সর্বোত্তম উপায়।

২.৭ নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বর্তমান সংস্থান

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তৃতির ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। নগর এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তৃতি কম। এর কারণ হলো নগরের চেয়ে গ্রামে অধিক সংখ্যক দ্ররিদ্র মানুষ বাস করে। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের বেশিরভাগ যেমন দুর্যোগ, ত্রাণ ও আয়সৃজনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রাম এলাকাকে লক্ষ্য করেই গৃহীত হয়ে থাকে। চিত্র ২.১২-এ গ্রাম ও শহর এলাকার পরিবারসমূহের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার অনুমিত বণ্টন দেখানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের অন্তর্ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় দ্বিগুণ হয়েছে। নগর এলাকায় খানাসমূহের আওতা বৃদ্ধির হার অনেক কম। ২০১০ সালে যেখানে নগর এলাকায় মাত্র ৯.৪ শতাংশ পরিবার নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা পেয়েছে, সেখানে গ্রাম এলাকায় পেয়েছে ৩০.১ শতাংশ পরিবার। এ পার্থক্য আঞ্চলিক পর্যায়েও লক্ষ্য করা যায়।

যাহোক, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির স্থানিক বণ্টনের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ধনী বিভাগগুলির (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) চেয়ে দরিদ্র বিভাগগুলি (বরিশাল, খুলনা, ও রাজশাহী) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ থেকে বেশি উপকার পেয়ে থাকে ।

চিত্র ২.১২: সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা গ্রহণকারী খানা (%)

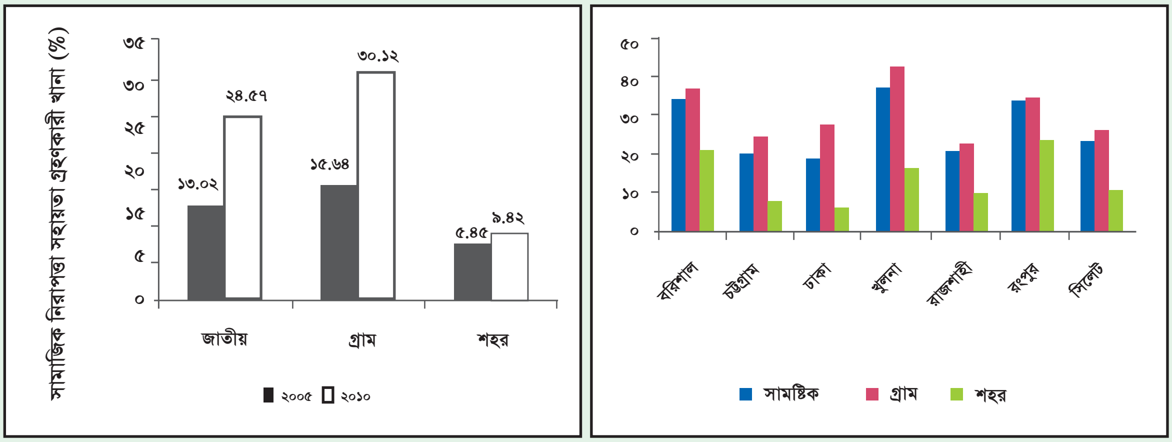

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০৫, ২০১০ ।

দুটি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগীর গ্রাম-শহর বিভাজন বিষয়ে সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্ত থেকেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বণ্টনে গ্রাম-শহর ব্যবধান প্রতীয়মান হয় । একটি কর্মসূচি হলো বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং অন্যটি হলো বিধবা ও দুস্থ নারী ভাতা কর্মসূচি । এ দুটিই আবার শর্তহীন নগদ সহায়তা প্রদানমূলক কর্মসূচি । সারণি ২.৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ দুটি কর্মসূচি সুস্পষ্টভাবে গ্রাম পক্ষপাতদুষ্ট । যদিও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শহর এলাকায় বাস করে এবং নগর দারিদ্র্যের প্রকোপ এখনও অনেক উচ্চ (১৭ শতাংশ), তথাপি নগর এলাকার জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ এসব কর্মসূচির আওতায় রয়েছে ।

সারণি ২.৩: উপকারভোগীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে গ্রাম/শহর বিভাজন

কর্মসূচির ধরন	জাতীয়	গ্রাম	শহর
বয়স্ক ভাতা	২৪,৭৫,০০০	২৩,২৭,২৪৭	১,৪৭,৭৫৩
	১০০%	৯৪.০৩%	৫.৯৭%
বিধবা ও দু:স্থ মহিলা ভাতা	৯,২০,০০০	৯,০৪,৫০২	১৫,৪৯৮
	১০০%	৯৮.৩২%	১.৬৮%

উৎস: সমাজ সেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস) ।

কেবল নগর এলাকার জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সংখ্যা খুব কম । এরকম একটি কর্মসূচি হলো খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি, যা নগর এলাকার দরিদ্রদের সুলভ মূল্যে খাদ্য শস্য প্রদানের লক্ষ্যে আশির দশকের প্রথমদিকে প্রবর্তিত হয় । আর দ্বিতীয় কর্মসূচিটি হলো ঘরে ফেরা কর্মসূচি । ১৯৯৯ সাল থেকে এ কর্মসূচি নগর এলাকায় দুঃখকষ্টে বসবাসকরী লোকদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে । গ্রামে গিয়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড করার জন্য এ ঋণ দেয়া হয় । পরিবহন বা যাতায়াত খরচ ও বসতি স্থাপনের খরচও এ ঋণের অন্তর্ভুক্ত । এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন হ্রাস, এবং পর্যাপ্ত প্রণোদনা দানের মাধ্যমে শহরে দুঃখকষ্টে বসবাসকারী মানুষদেরকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে শহরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন । তৃতীয় কর্মসূচিটি হলো- ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত লোকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি । ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচির জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও অদ্যাবধি এ কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি ।

নগর দরিদ্রদের জন্য আরেকটা বিশেষ কর্মসূচি হলো আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ইউসিডি) কর্মসূচি। পঞ্চাশের দশক থেকে এ কর্মসূচির মাধ্যমে শহর এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা দেয়া হচ্ছে। নগর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং স্বকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মতো বহুবিধ সহায়তা প্রদানের কারণে এটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে (সারণি ২.৪)। ২০০২ সাল থেকে সারা দেশে ইউসিডির আওতাধীন ৮০টি ইউনিট কার্যরত আছে।

সারণি ২.৪: আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ইউসিডি)-র বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী খানার সংখ্যা

বছর	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	সচেতনতা সৃষ্টি ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের আওতায় উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা
২০০৯	৪,৯৬২	১৫,৬০৪	১৯,৫০৭
২০১০	১,৪১৯	২০,৫৯০	২৫,৯০৪
২০১১	৯৯১	১১,০৬০	২৭,৫৫২
২০১২	৯৬৫	১২,১৩৪	২৪,৯৭৪

উৎস: সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস)।

সারণি ২.৪ থেকে দেখা যায় ইউসিডি'র কার্যক্রম ব্যাপক প্রশংসিত হলেও ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়কালে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী খানার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

ইউসিডি কর্মসূচি ছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস) দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শহর এলাকায় বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংগঠিত করা এবং প্রশিক্ষণ, ঋণ ইত্যাদির প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডকে সহায়তার উদ্দেশ্যে নতুন কর্মসূচি চালু করে। সুবিধাবঞ্চিত নগর জনগণ বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসকারীরা হলো এ কর্মসূচির প্রধান টার্গেট গ্রুপ। এসব কর্মসূচির আওতা ও বরাদ্দের পরিমাণ সারণি ২.৫ -এ দেয়া হয়েছে।

সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (বেসরকারি খাত কর্তৃক অর্থায়িতসহ) নগর ও গ্রামীণ জনগণের আওতা সারণি ২.৬ এ দেখানো হয়েছে। মোট কথা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে নগর এলাকার জনগণের চেয়ে গ্রাম এলাকার জনগণ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে। সকল সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার ৮৫ শতাংশ গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে পৌছে, আর শহর এলাকায় সে সুবিধা পেয়ে থাকে মাত্র ১৫ শতাংশ। নগর এলাকার জনগণ ওএমএস কর্মসূচি (চাল বিক্রি) থেকে বেশি উপকার ভোগ করে, যা খাদ্য ভর্তুকি হিসেবে কাজ করে।

সারণি ২.৫: নগর দরিদ্রদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কভারেজ ও বরাদ্দ

কর্মসূচির নাম	কভারেজ (লাখ জন/মাস)		বরাদ্দকৃত তহবিল (কোটি টাকায়)	
	অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১১-১২	অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১১-১২
শহর জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মসূচি	-	-	১৫.০০	১১২.৫১
শহর এলাকার দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা	০.৬৮	০.৭৮	২৮.৫০	৩২.৬০
শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা	১.৩৬	০.৬১	৫১.০০	২৩.০০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় বাজেট, অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত) এবং অর্থবছর ২০১১-১২।

সারণি ২.৬: স্থানভেদে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধার বণ্টন

কর্মসূচির বর্ণনা	বসবাস এলাকা		
	গ্রাম	শহর	মোট
সকল সামাজিক নিরাপত্তা	**৮৫.১**	**১৪.৯**	**১০০**
সকল সামাজিক বিমা (এসআই)	**৭৯.১**	**২০.৯**	**১০০**
বয়স্ক ভাতা: এসআই	৮৪.১	১৫.৯	১০০
বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা: এসআই	৯০.১	৯.৯	১০০
বেসরকারি বিমা: এসআই	৭৩.১	২৬.৯	১০০
পেনশন, গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড: এসআই	৫৯.৪	৪০.৬	১০০
সকল শ্রমবাজার কর্মসূচি (এলএম)	**১০০**	**০**	**১০০**
কাজের বিনিময়ে খাদ্য/নগদ অর্থ: এলএম	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি: এলএম	১০০	০	১০০
সকল সামাজিক সহায়তা (এসএ)	**৮৭.০**	**১৩.০**	**১০০**
জিআর/টিআর: এসএ	৯৩.৯	৬.১	১০০
ভিজিডি/ভিজিএফ: এসএ	১০০	০	১০০
উপবৃত্তি: এসএ	৯৩.৮	৬.২	১০০
কৃষি পুনর্বাসন: এসএ	৮৮.২	১১.৮	১০০
ব্যক্তি সহায়তা: এসএ	৮৩	১৭	১০০
অন্যান্য সহায়তা: এসএ	১০০	০	১০০
খোলা বাজারে বিক্রয়-ওএমএস: এসএ	০	১০০	১০০

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (২০১০) থেকে হিসাবকৃত।

টীকা: প্রাইভেট এসিসট্যান্স এর অন্তর্ভুক্ত হলো ধর্মীয় বা ঝুঁকি প্রশমন উদ্দেশ্যে টাকা বা দ্রব্যের আকারে সহায়তা প্রদান।

২.৮ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা

২.৮.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচিসমূহ

অন্যান্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগসহ দেশের সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর মানুষদের উদ্দেশ্যে কিছু কর্মসূচি রয়েছে। এ ধরনের ৩টি প্রধান কর্মসূচি হলো:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় উপকারভোগীদের জন্য ভাতা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য খাদ্য সহায়তা
- অবাঙালি পুনর্বাসন

পার্বত্য চট্টগ্রাম কর্মসূচিতে খানাপ্রতি গড়ে ১,৬৪৪ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে এ ভাতা কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। অবাঙালি পুনর্বাসন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রায় ০.১১ মিলিয়ন লোক এবং এজন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৭০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ০.৭১ মিলিয়ন লোক এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে এজন্য ২২৫৯ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

২.৮.২ দলিতদের জন্য কর্মসূচি

অন্যান্যদের ন্যায় দলিত পরিবারগুলোরও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে উপকার লাভের সমান সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, দলিতদের জন্য ‘জেলা শহরে সুইপার কলোনী নির্মাণ’ নামক একটি বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে ১০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

২.৮.৩ এইচআইভি/এইড্স আক্রান্তদের জন্য কর্মসূচি

যেসব খানায় এইচআইভি আক্রান্ত সদস্য রয়েছে সেসব খানা অন্য সব খানার ন্যায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া সরকার তার স্বাস্থ্য কৌশলকে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত লোকদের প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল ও রেসপনসিভ করতে চেষ্টা করছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলেও সরকারের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২.৮.৪ প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী অনুদান হিসেবে মাসে ৩০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়, যা মাথাপিছু জিডিপির ৫.৫ শতাংশ এর সমপরিমাণ। নেপালে মারাত্মক প্রতিবন্ধীদেরকে মাথাপিছু জিডিপির ২২ শতাংশের সমপরিমাণ অনুদান দেয়া হয় আর দক্ষিণ আফ্রিকায় তা মাথাপিছু জিডিপির ২৮ শতাংশের সমপরিমাণ। সুতরাং বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী সহায়তা হিসেবে প্রদত্ত ভাতা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী অত্যন্ত স্বল্প।

কর্মক্ষম বয়সী বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রতিবন্ধী অনুদান প্রায় ২,০০,০০০ লোককে দেয়া হয় যদিও প্রতিবন্ধী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যও একটি ছোট স্কিম আছে। যদি কর্মক্ষম বয়সীদের মধ্যে চরম প্রতিবন্ধী ১.১ মিলিয়ন লোক রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়, তবে কর্মসূচির আওতা ২০ শতাংশের নীচে নেমে আসে। কিছু বিশেষ প্রতিবন্ধী স্কিম হলো ইনস্টিটিউট ফর অটিসটিক এন্ড ব্লাইন্ড চিলড্রেন, সোশালি ডিজএবলড এডোলসেন্ট গার্লস, প্রতিবন্ধী মেয়েদেরক জন্য প্রমোশনাল সেবা ইত্যাদি।

২.৮.৫ দারিদ্র্যে নিপতিত নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি

সমাজে নারীদের অসুবিধাজনক অবস্থানের বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে সচেতন। ফলে বৃহত্তর সমাজ উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে অসুবিধার উৎস সমূহ বন্ধ করার লক্ষ্যে অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক ও ইতিবাচক পদক্ষেপের নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়াও দরিদ্র নারীদের সহায়তা করতে বেশকিছু বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এসকল কর্মসূচি ও প্রদত্ত বরাদ্দ সারণি ২.৭ -এ দেখানো হলো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল ১৯৯৮ সালে চালু হওয়া বিধবা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচি। এ কর্মসূচির জন্য প্রারম্ভিক বাজেট ছিল ১২৫ মিলিয়ন টাকা, উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ০.১ মিলিয়ন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা। এ কর্মসূচির বাজেট, উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ ধাপে ধাপে বেড়ে ২০১২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৩১২ মিলিয়ন টাকা, ০.৯২ মিলিয়ন জন ও ৩০০ টাকা হয়েছে (সারণি ২.৭)।

কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভাতা পেতে কিছু মানদণ্ড বা শর্ত পূরণ করতে হয়। সরকারি পেনশনভোগী, ভিজিডি কার্ডধারী, সরকার থেকে নিয়মিত অনুদান বা ভাতা গ্রহীতা এবং বেসরকারি সংস্থা থেকে নিয়মিত অনুদান বা ভাতা গ্রহীতা এ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়।

সারণি ২.৭: নারী লক্ষ্যিত বিভিন্ন কর্মসূচির কভারেজ ও বরাদ্দ

কর্মসূচির নাম	কভারেজ (লাখ জন/মাস)		বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	
	অর্থবছর ২০১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১১ (সংশোধিত)	অর্থবছর ২০১২
বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা	৯.২০	৯.২০	৩৩১.২০	৩৩১.২০
মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম	১.৭৯	২.৪৪	৬৬.২০	৯০.০০
দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা	০.৮০	০.৯২	৩৬.৯৬	৪২.৫০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় বাজেট, অর্থবছর ২০১০-১১ (সংশোধিত) এবং অর্থবছর ২০১১-১২।

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের এমডিজি অর্জনে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করা হয়। এ স্কিমের আওতায় কিছু সুনির্দিষ্ট সেবা ক্রয়ে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ স্কিমের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মাতৃস্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসবের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুর হার হ্রাস করা। এ স্কিম প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২১টি জেলার ২১টি উপজেলায় শুরু হলেও পরবর্তীতে আরও ৫৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এ কর্মসূচিতে (MHVS) সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়ন করে থাকে।

এ স্কিমের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি বছর ১,৭৪,০০০ জন গর্ভবতী মহিলাকে সেবা প্রদান করা। এ স্কিমের সুবিধাভোগীদের অবশ্যই দরিদ্র ও দুঃস্থ গর্ভবতী মহিলা হতে হবে, ভূমিহীন হতে হবে, খানা প্রতি মাসিক আয় ২,৫০০ টাকার কম ও অনিয়মিত হতে হবে এবং উৎপাদনমূলক সম্পদ নেই এমন মহিলা হতে হবে।

এ স্কিমের উপাদানগুলো হলো: তিনটি প্রসবপূর্ব ভিজিট, নিরাপদ প্রসব, সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহের মধ্যে একটি প্রসব পরবর্তী ভিজিট, গর্ভকালীন জটিলতা সম্পর্কিত সেবা প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সেবার জন্য ৫০০ টাকা পরিবহন ব্যয় প্রদান, জেলা হাসপাতালে রেফারেলের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত এবং দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা সন্তান প্রসব হলে মাকে নগদ ২,০০০ টাকা প্রদান। নির্ধারিত সেবা প্রদানকারী এবং সরকারি ও বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহ থেকে সুনির্দিষ্ট ও বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচির পিছনে প্রধান যুক্তি হলো এই যে, সুস্থ মা মানে সুস্থ শিশু। শহর এলাকার অতিদরিদ্র ও কর্মজীবী স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ৩০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা ছাড়াও দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ৪৩০.৬ মিলিয়ন টাকা (পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১০০ মিলিয়ন টাকা বেশি) বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে যার অনেকগুলো জীবনচক্র কাঠামোভিত্তিক। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে এসকল সফলতাকে কাজে লাগিয়ে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে।

অধ্যায় ৩

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড

অধ্যায় ৩
সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড

৩.১ ভূমিকা

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলি ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাজার অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এবং এ খাতে বছরে জিডিপির ২ শতাংশের বেশি ব্যয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যা বেশিরভাগ নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং এ ব্যবস্থা যাতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের উপযোগী হয় সেজন্য সরকার এর আধুনিকায়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়। এ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।[৯]

৩.২ উচ্চ ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গঠন ও ধরন

বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত অতিদরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্য করে কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো যা ছিল অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে অনুসৃত ‘পুওর রিলিফ’ মডেল এর মতো। তবে সময়-পরিক্রমায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সেগুলো দারিদ্র্যের কারণ এবং জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগের বৃহৎ অংশ বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, শিশু, বিধবা ও বেকার বা কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই করা হয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা বিনিয়োগের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র সাধারণ দরিদ্রদের ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য রাখা হয়। চিত্র ৩.১ এ বিভিন্ন উচ্চ আয়ের দেশের বিভিন্ন জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল দেশে একই ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে এসব দেশ শুরুতে বয়স্ক পেনশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তারপর পর্যায়ক্রমে তারা প্রতিবন্ধী, শিশু এবং সময় সময় বিধবা ও একাকি মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। বস্তুত, বয়স্কদের জন্য পেনশন উন্নয়নশীল দেশের সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। মেক্সিকো ও ইকুয়েডরের মত কিছু উন্নয়নশীল দেশ আশি ও নব্বই দশকের প্রথমদিকে দরিদ্রদের জন্য ত্রাণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিলেও প্রাথমিকভাবে বয়স্ক পেনশন কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা এখন জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচি চালু করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

[৯] এই অধ্যায়টি ব্যাকগ্রাউন্ড গবেষণা প্রতিবেদনের পেপার নম্বর ৯-এর সংযুক্তি ১ এর উপর ভিত্তি করে রচিত। উক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড গবেষণা প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষণার পরিপূর্ণ তালিকা বিধৃত হয়েছে।

চিত্র ৩.১: কতিপয় নির্বাচিত উচ্চ আয়ের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যয়

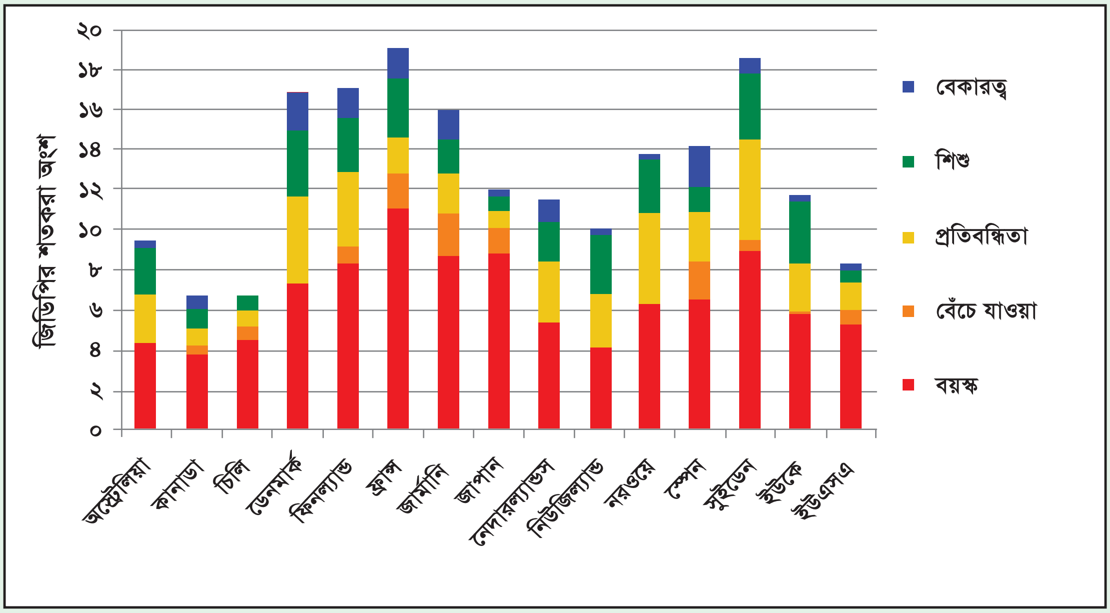

উৎস: ওইসিডি সোশাল এক্সপেন্ডিচার ডাটাবেজ

বর্তমানে অধিকাংশ দেশ প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিশু অনুদান কর্মসূচি চালু করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও ভিয়েতনামে কিছু বৃহৎ আকারের প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রতিটির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি। ধীরে ধীরে শিশুদের জন্য সহায়তা বা ভাতা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮ বছর বয়সী শিশুদের ৫৮ শতাংশ, আর্জেন্টিনায় ৬৫ শতাংশ এবং ব্রাজিলে ৬৩ শতাংশ শিশুদের জন্য পরিচালিত অনুদান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নেপাল- যেখানে ইতোমধ্যেই সর্বজনীন বা ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম আছে, অতি সম্প্রতি ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু অনুদান কর্মসূচি চালু করেছে।

জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক এগিয়ে। চিত্র ৩.২ এ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রদর্শন করা হয়েছে (জীবনচক্রের বিপরীতে ম্যাপ করা)। দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কোনো উন্নত দেশের অনুরূপ হলেও বেকারদের জন্য তাদের গৃহীত কর্মসূচিসমূহ স্বল্পোন্নত দেশের সমপর্যায়ের। চিত্র ৩.২ থেকে কর্মসূচিসমূহের আওতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপকারভোগীর সংখ্যা বিবেচনায় সর্ববৃহৎ স্কিম হলো শিশু সহায়তা ভাতা। ১১ মিলিয়নের বেশি শিশু এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বোচ্চ ব্যয় হয় বয়স্ক পেনশন কর্মসূচিতে যা দেশটির জিডিপির প্রায় ১.২ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রম-কৌশলে জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে স্বীকৃত। জীবনচক্র ভিত্তিক পদ্ধতি অধিকন্তু সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর পদ্ধতিকেও সমর্থন করে। সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর জাতিসংঘ কর্তৃক চালু হয় এবং বাংলাদেশ সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক তা গৃহীত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, শিশু ও বেকারদের জন্য ৪টি মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর এর প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে যে যদি জনসংখ্যার এসব নাজুক অংশ সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে দরিদ্র পরিবারগুলো এবং যারা ইতোমধ্যেই দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

চিত্র ৩.২: দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

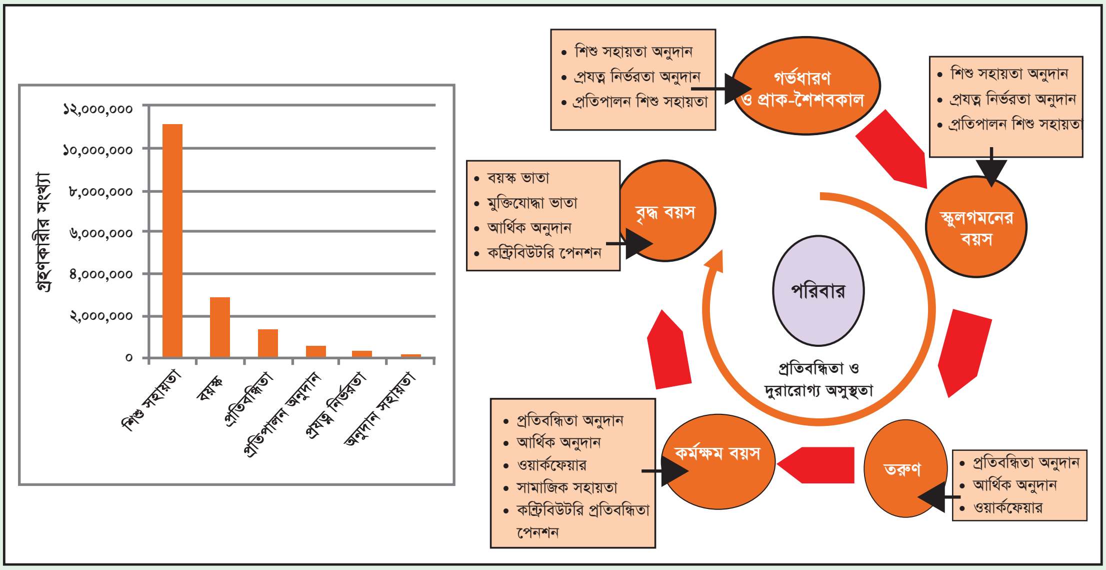

উৎস: সাউথ আফ্রিকা সোশ্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন ২০১১-১২ এর উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রচিত

৩.৩ স্বেচ্ছামূলক (কন্ট্রিবিউটরি) ও সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর দেশগুলোও সরকার কর্তৃক অর্থায়িত স্কিমসমূহ এবং সামাজিক বিমা স্কিমসমূহের মধ্যে আপেক্ষিক ভারসাম্য বিধানের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক অর্থায়ন কৌশলেরই সুবিধা-অসুবিধা দুটিই আছে। তবে প্রায় সব উচ্চ আয়ের দেশ উভয় প্রকার অর্থায়ন কর্মসূচির একটি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, যদিও এ দুটির মাঝে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কখনও কখনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অপরিহার্য অনুসৃত নীতিগুলো হলো: সরকারি ব্যয়-অর্থায়ন নাগরিকদের ন্যূনতম পর্যায়ের সুবিধা প্রদানে ব্যবহৃত হওয়া উচিত; দরিদ্র, অপ্রতিষ্ঠানিক ও ঝুকিপূর্ণ খাতে নিয়োজিত ও কর্মহীনদের উপরে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য ঘাটতি বা ব্যবধানকে দূর করা উচিত। যাদের জীবনচক্র সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি যেমন বৃদ্ধ বয়স, অসুস্থতা ও কর্ম সম্পর্কিত দুর্ঘটনার জন্য অতিরিক্ত বা বাড়তি নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত আয় আছে সামাজিক বিমা স্কিম অন্যদিকে তাদেরকে আরো সক্ষম করে তুলতে পারবে।

সরকারি ব্যয়-অর্থায়িত স্কিম এবং সামাজিক বিমা স্কিম উভয়টিই একই ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে থাকে। তবে সামাজিক বিমা স্কিমসমূহ সাধারণত বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সুবিধার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও অন্যান্য ঝুঁকি, যেমন অসুস্থতা, বেকারত্ব বা কর্মহীনতা ও মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রেও বিমা সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো যে দেশগুলোর জনসংখ্যার ক্ষুদ্র অংশ আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। সামাজিক বিমা ব্যবস্থা তখনই কাজ করে যখন কোনো বিমা স্কিমে মাসে মাসে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। আর তা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কর্মীদের পক্ষেই প্রদান করা সম্ভব। সুতরাং অনেক দেশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সামাজিক বিমাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করলেও এ খাতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই কেবল সামাজিক বিমা বিষয়টিকে চালু করতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ গত ৩০ বছরে শ্রীলংকা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি বা স্বেচ্ছামূলক পেনশন স্কিম চালুর ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু দেখা গেছে কন্ট্রিবিউশন বা বিমার চাঁদার পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও পেনশন বিমা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য কর্মীদের একটি ক্ষুদ্র অংশই মাত্র পেনশন বিমা স্কিমে প্রবেশ করে এবং তাদের সদস্যপদ অব্যাহত রাখে। অধিকন্তু পেনশনের সুবিধা স্বল্প মূল্যেই কেনা সম্ভব এবং কোনো স্কিমই বিমার দৃষ্টিতে দক্ষ নয়, অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্ব সরকার কর্তৃক বহন করতে হবে।

দেখা গেছে, দেশসমূহ উন্নত হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক বিমা স্কিমের আওতা প্রায়শ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের বয়স্ক পেনশন কর্মসূচির বেশিরভাগই চাঁদা থেকে অর্থায়িত হয়ে থাকে। থাইল্যান্ডে ২০-৩০ শতাংশ বয়স্ক মানুষ কন্ট্রিবিউটরি পেনশনের আওতায় সুবিধা পেয়ে থাকে। যাহোক, ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক বিমার পরিধি বৃদ্ধি পায়। এটা স্বীকার্য যে, বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে সরকার কর্তৃক অর্থায়িত স্কিমসমূহ অপরিহার্যভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয়। এছাড়া জনগণকে বাড়তি বা অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদান করতে সামাজিক বিমা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নেওয়াও প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে জাতিসংঘের

সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর স্বীকার করে যে, সামাজিক বিমা স্কিম সরকারি অর্থায়িত স্কিমসমূহের পরিপূরক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৪ কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই

জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধাবিত হওয়ায় যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, সরকারি পর্যায়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে কি করে সর্বোত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। দরিদ্রদেরকে কীভাবে বাছাই বা টার্গেট করা যায় তা সব দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশও একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেখা গেছে, অনেক কর্মসূচিতেই যথাযথ ও সঠিকভাবে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ যেখানে অতিদরিদ্রদের অভিমুখী সেখানে চিত্র ৩.৩ প্রকৃত উপকারভোগীরা সম্পদ কাঠামোর কোথায় অবস্থান করে তা নির্দেশ করছে। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, দরিদ্ররা সচ্ছলদের চেয়ে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও দরিদ্রদের অনেকেই মোটেই উপকৃত হয়না বা সুবিধা পায়না। বস্তুত, তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রায় ব্যয় করা সত্ত্বেও ২০১০ সালে দরিদ্রদের মাত্র ৩৫ শতাংশ সরকারের কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেয়েছে।

বাংলাদেশ কেবল যে একাই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা না। অনেক মধ্যম আয়ের দেশ যাদের প্রশাসনিক কাঠামো বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তারাও দরিদ্রদের সঠিকভাবে বাছাইয়ে হিমশিম খেয়েছে। ব্রাজিলে জনসংখ্যার ২০ শতাংশ থেকে সামান্য বেশি বোলসা ফ্যামিলিয়া ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিম থেকে সুবিধা পেলেও দরিদ্রদের ৫৯ শতাংশ বাদ পড়ে যাচ্ছে। মেক্সিকোর জনসংখ্যার ২০ শতাংশ অপরচুনিডেইডস[১০] কর্মসূচির আওতাভুক্ত হলেও দরিদ্রদের ৭০ শতাংশ কর্মসূচির বাইরে থেকে যায়। জর্জিয়ার জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশের প্রায় ৭০ শতাংশ টার্গেটেড সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতার বাইরে।

যেসব কর্মসূচি দরিদ্রদের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে কেবল সেগুলিই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। অনেক দেশই পেনশনে সর্বজনীন প্রবেশ সুবিধা প্রদান করে, ফলে অতি অল্পসংখ্যক দরিদ্র মানুষ বাদ পড়ে। এসব স্কিম উচ্চ আয়ের দেশে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে বেশকিছু উন্নয়নশীল দেশেও তা লক্ষ্য করা যায়, যেমন-বলিভিয়া, ব্রাজিল, জর্জিয়া, লেসেথো, মরিশাস, মেক্সিকো, নামিবিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান ইত্যাদি। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বয়স্ক পেনশন কর্মসূচিভুক্ত এবং এর ফলে মাত্র ১৩ শতাংশ দরিদ্র বাদ পড়ে। শিশু অনুদান অধিক সংখ্যক শিশুর কাছে প্রসারিত হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ার মতো দেশে শিশু সহায়তামূলক কর্মসূচিসমূহে দরিদ্র শিশুদের ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে।

চিত্র ৩.৩ বাংলাদেশে প্রতিটি ডেসাইলে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মধ্যে যারা কমপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করে তাদের অনুপাত

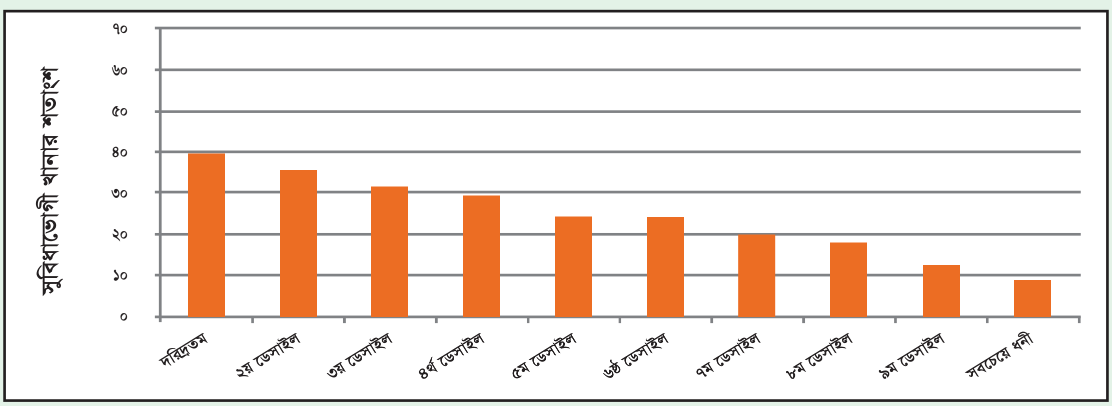

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০,বিবিএস ।

৩.৫ সামাজিক নিরাপত্তা এবং শ্রমবাজার

সুষ্ঠু সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রধান নীতি হলো যে এটি শ্রমবাজারে উপকারভোগীদের, বিশেষ করে কর্মক্ষম বয়সী বা কর্মজীবীদের সম্পৃক্ততাকে খর্ব ও ব্যাহত করার পরিবর্তে বরং সহজতর করবে। বস্তুত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ সহায়তা প্রাপ্তি যে জনগণকে শ্রমবাজারে প্রবেশে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক ভালো নজির রয়েছে। ব্রাজিলে বোসলা ফ্যামিলিয়া কর্মসূচি পরিবারগুলোর শ্রম অংশগ্রহণ হার ২.৬ শতাংশ এবং এতে মহিলাদের অংশগ্রহণ হার ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।

[১০] ২০১৪ সালে এই কর্মসূচীর নামটি পরিবর্তিত হয়ে প্রসপেরা হয়।

একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব পরিবার শিশু সহায়তা অনুদান পায় তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ১৫ শতাংশের বেশি। কর্মসংস্থান হারের বৃদ্ধির একটি কারণ হলো উপকারভোগীরা তখন বেশি করে কাজের সন্ধান করে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশু সহায়তা অনুদান গ্রহণকারী পরিবারগুলোর কর্ম বা চাকুরী খোঁজার প্রবণতা যেসব পরিবার শিশু সহায়তা অনুদান কর্মসূচির বাইরে রয়েছে তাদের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও দেখা গেছে অনুদান বা সুবিধা গ্রহণকারীদের চাকুরী খোঁজার প্রবণতা বেশি, কারণ তাদের বাস ভাড়া দেয়ার এবং ভালো বস্ত্র পরিধানের সামর্থ্য রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কেন শ্রমবাজারে অধিকতর সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম করে তার নানাবিধ কারণ রয়েছে। ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ঋণ দিতে আগ্রহী হতে পারে কারণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জনসাধারণ কখনো কখনো পুঁজিও পেয়ে থাকে। যাহোক, নিয়মিত ট্রান্সফার বা সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, কর্মসূচির সুবিধাভোগীদেরকে প্রণোদনা প্রদান করতে পারে। এটি তাদের ন্যূনতম আয়ের উপায়ের ব্যবস্থা করে যা পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে উৎসাহিত করে। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক অনুদান গ্রহণকারী পরিবারগুলি বর্ধিতভাবে উদ্যোক্তাসুলভ আচরণ করে এবং অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অথচ উচ্চ রিটার্ণ পাওয়া যায় এমন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে তারা অধিকতর ইচ্ছুক হয়ে থাকে।

পরিবারগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি একাই যথেষ্ট নয়। চিত্র ৩.৪ শ্রমবাজারে পরিবারগুলির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হলে অন্য তিনটি মূল ক্ষেত্রেও সহায়তা বা সাপোর্ট প্রদানের গুরুত্বকেই নির্দেশ করছে: ১.অর্থায়নের সুযোগপ্রাপ্তি, যাতে জনগণ ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা যেমন, সঞ্চয় হিসাব খোলা ও বিমা ক্রয় করার সুযোগ পায়, তাদের ভোগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং ভালোভাবে বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে; ২. বিপনন মূল্য শৃঙ্খল উন্নতিসাধন করতে পারে, যাতে উৎপাদনকারীরা বিশেষ করে দরিদ্ররা তাদের বিক্রীত পণ্য ও সেবার ন্যায্য দাম পায়; এবং ৩. শ্রমবাজারে যথাযথ নজরদারি, যা শ্রমশক্তির দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উচ্চ আয়ের দেশে শিশু দারিদ্র্য হ্রাসের একটি অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে মায়েদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে শিশু পরিচর্যা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। মায়েদেরকে শ্রমবাজারে টিকে থাকতে সক্ষম করার মাধ্যমে পরিবারের বিশেষ করে একক পরিবারের প্রধান বিশিষ্ট বা সিঙ্গেল হেডেড পরিবারগুলার আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

চিত্র ৩.৪: দারিদ্র্য হ্রাস ও দারিদ্র্য ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা নির্মাণে শ্রমশক্তিকে সহায়তার চারটি ক্ষেত্র

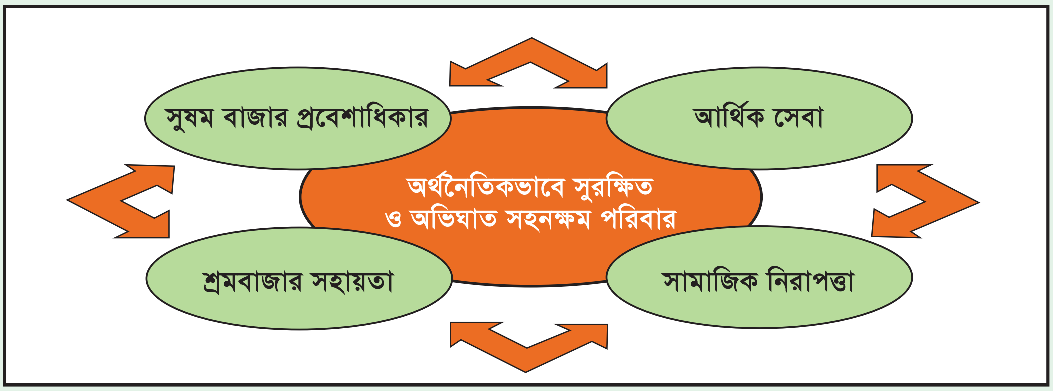

বাংলাদেশের অন্যতম এনজিও ব্র্যাক পরিচালিত গ্রাজুয়েশন কর্মসূচিসমূহ অতিদরিদ্রদেরকে বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করার একটি উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি। বিশ্বের অনেক দেশে বর্তমানে এ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ হস্তান্তর, বৃত্তি, সঞ্চয়, স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা, ব্যবসা-উদ্যোগ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি উপাদান কাজে লাগানো হয়। ঝুঁকির সম্মুখীন মহিলাদের উদ্দেশ্য করে নেয়া ব্র্যাকের সিএফপিআর-টিইউপি কর্মসূচি থেকে দেখা যায় যে, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বার্ষিক আয়ের গড় বৃদ্ধি ১,৮৭৫ টাকা, যা সাত বছর (২০০৭-২০১৪) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়কালে এ কর্মসূচিগুলোতে বছরে ৩,২২০ টাকার সম্পদ বৃদ্ধি ঘটেছে। এ গ্রাজুয়েশন এপ্রোচ অন্যান্য এনজিও কর্তৃক অতিদরিদ্র খানাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রমাণিত উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এসব অতিদরিদ্র খানাগুলোর মহিলারা যেহেতু নিম্ন ভিত্তির আয় দিয়ে শুরু করে এবং নানা ধরনের ঝুঁকিতে থাকে সেহেতু গ্রাজুয়েশন কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পরও তাদেরকে অন্যান্য ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদানের সুযোগ অব্যাহত রাখার দরকার হতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে তাদেরকে যেন অপরিণত অবস্থায় গ্রাজুয়েট করা না হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার শিশু সহায়তা অনুদান পরিবারগুলিকে শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে এবং এমনকি পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি পেয়ে নির্ধারিত আয়যোগ্যতার সীমা অতিক্রম করলেও তাদের ক্ষেত্রে অনুদান পাওয়ার সুযোগ অব্যাহত থেকেছে। অধিকন্তু অনুদান পাচ্ছে এমন পরিবার যদি কোনো সংকটে পতিত হয়ে যায় তাহলে এটি তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে। যেহেতু এই স্কিমে চাহিদার ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়, যদি কোনো অবস্থাপন্ন বা সচ্ছল পরিবার অভিঘাতের শিকার হয় এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে পতিত হয় তাহলে তারাও যে কোনো সময় স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অন্য কথায় বলতে গেলে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুকরা যেকোনো সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক নিরাপত্তা এজেন্সিতে যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকানদেরকে মেক্সিকো, কলম্বিয়া, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মতো অনিয়মিত ও মাঝে মাঝে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত বাছাই ও রেজিস্ট্রেশন প্রচারণার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

৩.৬ সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করছে। কর্মসূচির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হলে একদিকে যেমন কর্মসূচিগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে তেমনই তহবিল ঝুঁকিও হ্রাস পাবে। সাধারণত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের উপর দৃষ্টি প্রদান করা হয়: কর্মীদের/স্টাফদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারিকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন; এবং উপকারভোগীদের কাছে অনুদান পৌছানো।

৩.৬.১ স্টাফ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারিত্বকরণ

যে কোনো কর্মসূচির সফলতা নির্ধারণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্টাফ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পেশাদারিত্ব। বৃহৎ সামাজিক কর্মসূচিসমূহ বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে, প্রায়শই অন্য কোনো কাজে ইতোমধ্যে নিয়োজিত এমন স্টাফ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির নানাবিধ কুফল রয়েছে। এমন স্টাফ প্রায়শই অপ্রশিক্ষিত হয়ে থাকে এবং দক্ষভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে না; জব ডেসক্রিপশনে উল্লেখ নেই এমন কাজ তাদেরকে দেয়া হয় এবং তারা তা পছন্দ করে না। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহ পরিচালনার বাড়তি দায়িত্ব পালনের কারণে তাদের কাজের বোঝা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রধান দায়িত্বাবলী সংকুচিত হয়ে যাবার ফলে তারা তা সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না। ফলে স্কিমসমূহ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার ঝুঁকিতে থেকে যায়।

বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনায় পেশাদার স্টাফ নিযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত হলেও স্কিমের প্রকৃত ডেলিভারীর দায়িত্ব আধা-স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক নিরাপত্তা এজেন্সির (এসএএসএসএ) উপর ন্যাস্ত যা সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কাছেই জবাবদিহি করে। এসএএসএসএ-এর সকল স্তরে পেশাদার স্টাফ নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, এমনকি স্থানীয় পর্যায়ের অফিসেও যারা আবেদনকারী ও উপকারভোগীদের বিষয় দেখভাল করে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে, এমনকি উগান্ডাতেও অনেক স্কিমই একনিষ্ঠ পেশাদার স্টাফদের দিয়ে পরিচালিত হয়। সাধারণ বয়স্ক পেনশন স্কিমও বাস্তবায়িত হয় জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত কর্মীদের দ্বারা।

কর্মতৎপর মন্ত্রণালয় ও স্টাফের উপস্থিতি সামাজিক নিরপত্তা স্কিমসমূহ পরিচালনার জন্য অনেক সুবিধাজনক। এতে করে স্কিমগুলো অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় এবং স্টাফরা কম মাত্রায় দুর্নীতিপরায়ণ হয় ও ব্যক্তিগত লাভের জন্য উপকারীভোগী নির্বাচন পদ্ধতিতে কোনো ব্যত্যয় ঘটায়না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ পরিচালনায় পেশাদারিত্বের মানে হলো বিশেষায়িত ও উচ্চ প্রশিক্ষিত স্টাফ সমন্বিত উন্নত ও আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা, যা প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া এটি স্কিমসমূহের দক্ষতা বাড়ায়, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৬.২ তথ্য ব্যবস্থাপনায় ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্কিমসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধুনিক এমআইএস প্রবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণে বিভিন্ন দেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রশাসনে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ছাড়াও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে পারে।

মাঝারি আয়ের অনেক দেশ বহুদিন ধরেই আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার একটি আধুনিক সিস্টেম রয়েছে, যার আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রবেশের পর তা তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা এজেন্সিতে প্রেরণ করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি থাকলেও প্রতিটি কর্মসূচির এমআইএস একে অপরের সাথে এমনকি ট্যাক্স রেকর্ড সিস্টেমের সাথেও সংযুক্ত হতে পারে। ফলে কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি ও পারফরমেন্স যেমন পরিবীক্ষণ করা যায় তেমনি জালিয়াতিও কমানো যায়। যাহোক, অনেক নিম্ন আয়ের দেশ আধুনিক এমআইএস পদ্ধতি চালু করছে এবং স্থানীয় কমিউনিটি ও জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের অফিসে তথ্য প্রেরণ করতে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের সুবিধা গ্রহণ করছে। সম্প্রতি কেনিয়া একটি একক রেজিস্ট্রি সিস্টেম প্রতিষ্টা করেছে যা এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রতিটিতে অভিন্ন এমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা সচিবালয়কে মনিটরিং সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছে। বস্তুত এমআইএস হচ্ছে ওয়েবভিত্তিক একটি সিস্টেম যাতে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে এবং এ তথ্যের নিরাপত্তায় কঠোর নিরাপত্তা প্রটোকল সংযুক্ত থাকে।

৩.৬.৩ সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদানের জন্য আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি নতুন উদ্ভাবন হলো সুবিধাভোগীদের অনুদান প্রদানে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সেগুলোকে আর্থিকভাবে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। সুবিধাভোগীদের হাতে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও পেমেন্ট এজেন্টদের দ্বারা হয়রানির যথেষ্ট সুযোগ থাকে এবং অর্থ প্রদান সংক্রান্ত ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। বস্তুত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ট্রান্সফার খরচের ৪ থেকে ২৫ শতাংশ অপচয় হয়ে থাকে বলে হিসাব করা হয়েছে। নগদ অর্থ সহায়তা আধুনিক উপায়ে, যেমন ব্যাংক বা মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে প্রদান করতে পারলে ডেলিভারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের সুবিধার্থে পেমেন্ট প্রক্রিয়াকে অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না। দেখা গেছে, ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে লিকেজের পরিমাণ ১ থেকে ৫ শতাংশ হয়ে থাকে। আরেকটা বিকল্প হতে পারে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা যাতে সুবিধাভোগীরা আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের প্রথাগত গ্রাহক হিসাবে অন্যান্য ব্যাকিং সেবা, যেমন ঋণ ও বিমা সুবিধা, প্রাপ্তির সুযোগ পেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে কিছু দেশ আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক পেমেন্ট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ব্রাজিলে মূলধারার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বোলসা ফ্যামেলিয়া কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের পেমেন্ট প্রদানের হার ২০০৯ সালের ২ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে ২০১১ সালে ১৫ শতাংশে দাড়িয়েছে। মেক্সিকোর অপরচুনিডেইডস কর্মসূচিতে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের হার ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪ শতাংশে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৭ ও ২০১১ সালের মধ্যে তা ২৮ থেকে ৫৯ শতাংশে উপনীত হয়েছে। অধিকন্তু, ব্রাজিলে পেমেন্টের ৯৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শতভাগ পেমেন্ট ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রগতি কেবল মাঝারি আয়ের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ কেনিয়ার একটি দুর্গম এলাকায় হাঙ্গার সেফটি নেট নামক কর্মসূচিতে সকল সুবিধাভোগীর জন্য প্রথাগত ব্যাংক একাউন্ট খোলা হচ্ছে, এছাড়া যেখানে স্থানীয় ব্যাংক এজেন্ট, দোকান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির অর্থ সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগও রাখা হচ্ছে। নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানে মূলধারার ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করলে অর্থ প্রদান সংক্রান্ত বয় স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। ব্রাজিলে অর্থ প্রদানে প্রথাগত ব্যাংক একাউন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করার ফলে পেমেন্ট প্রতি খরচ ০.৮৮ মার্কিন ডলার থেকে কমে ০.৬০ মার্কিন ডলার হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে পেমেন্ট খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমে ৪.৪৬ মার্কিন ডলার থেকে ২.০৩ মার্কিন ডলারে হ্রাস পেয়েছে। পেমেন্ট সেবা প্রদানকারীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া দেশ ভেদে ভিন্ন হয়: ব্রাজিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (Caixa Economica Federal) মাধ্যমে করা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়ায় বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। অধিকন্তু, পেমেন্টের সার্বিক দায়িত্ব সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল এজেন্সিসমূহের উপর বর্তায় না। ব্রাজিলে পেমেন্ট প্রক্রিয়া দেখভাল করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তা করে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়। যাহোক, সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিসমূহের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকে, কেননা তাদেরকে পেমেন্ট সেবা প্রদানকারীদেরকে কর্মসূচির উপকারভোগী সম্পর্কিত হালনাগাদ তালিকা প্রদান করতে হয় এবং কর্মসূচিসমূহের সার্বিক দায়িত্বও মন্ত্রণালয়ের উপরেই বর্তায়।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, দারিদ্র্য মোকাবেলায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে সামাজিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশ বর্তমানে যে বিনিয়োগ করছে তার দক্ষতা ও কার্যকারিতা কীভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় হলো: সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জীবনচক্র পদ্ধতি গ্রহণ করা; সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত কর্মসূচি

এবং কন্ট্রিবিউটরি অর্থে অর্থায়িত কর্মসূচির মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন; এবং যথাযথ ও সঠিক পরিকল্পনা, সমন্বয়, উপযুক্ত স্টাফিং, সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের যথোপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন এবং এমআইএস ও পেমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনিক উন্নয়ন সাধন। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেসব জ্ঞান ও ধারণা বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ সংলাপ ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বের সফল কল্যাণমূলক রাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অব্যাহত রাখবে।

অধ্যায় ৪

সামাজিক নিরাপত্তার কৌশলগত ধারণা ও প্রস্তাবনা

অধ্যায় ৪
সামাজিক নিরাপত্তার কৌশলগত ধারণা ও প্রস্তাবনা

৪.১ ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জাতীয় বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাতে ব্যয় করা হলেও কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত প্রভাব প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। এ অবস্থা নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মাধ্যমে সরকার দেশের অতিদরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদেরকে ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করতে চায়; একই সাথে সুরক্ষিত রাখতে চায় দারিদ্রে নিপতিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে।

বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখে। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন; এমনকি আগামী পাঁচ বছরও এর জন্য যথেষ্ট নয়। এ অধ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এসব কৌশলের সঠিক প্রয়োগের ফলে আগামী পাঁচ বছর পর দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রোথিত হবে এবং এ খাতের আরো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও রূপকল্প অর্জনের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলটি প্রণীত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নব্বই দশকের পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমশ জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে যেমনটি পৃথিবীর অনেক মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা গেছে, প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষত বয়স্ক জনগোষ্ঠি ও কম বয়সী শিশুদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহে অনেক গুরুত্বর ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া কোনো কর্মসূচিরই উপকারভোগীর সংখ্যা এবং সহায়তার পরিমাণ এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত নয়।

প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে জোরালো ও সংহত করবে। এ কৌশলের প্রাথমিক কার্যক্রম হবে বর্তমানের অসংখ্য কর্মসূচিকে স্বল্পসংখ্যক অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচিতে একীভূত করা। অধিকসংখ্যক দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করাই হবে এর মূল উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচিসমূহে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও দারিদ্র্যে নিপতিত হবার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অধিকতর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে।

প্রথম অধ্যায়ে যেমনটা বলা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবা হলেও একে সেবা কার্যক্রমে বিনিয়োগের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে (চিত্র ৪.১)। সুতরাং, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক পরিষেবা এবং পানি ও স্যানিটেশনের মতো অন্যান্য সেবার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হলে এবং দেশের সকল নাগরিকের জন্য এসকল সেবার সুফল ভোগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করার পাশাপাশি সরকারকে এসকল খাতেও বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। এমন পরিপূরক সেবার একটি উদাহরণ হলো দেশের সকল পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির উপায় হিসেবে স্বাস্থ্যবিমা প্রবর্তনে সরকারের প্রতিশ্রুতি। এটি সামাজিক নিরাপত্তায় গৃহীত উদ্যোগসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

চিত্র ৪.১: সরকারের বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন নীতি ভিত্তিক সহায়তার কেন্দ্রে পরিবার ও ব্যক্তি

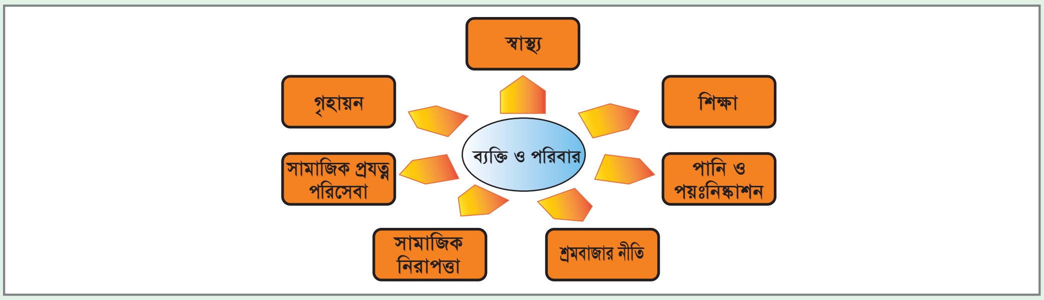

কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলো দারিদ্র্য বিমোচনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এজন্য সরকার এমনভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করবে যাতে পরিবারগুলো শ্রমবাজারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। এসব উদ্যোগ সাধারণভাবে 'উত্তরণ' (গ্র্যাজুয়েশন) নামে অভিহিত হয়। তবে এ অধ্যায়ে এসব উদ্যোগকে 'পরিপূরক শ্রমবাজার উদ্যোগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটি দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরণ ঘটানো সত্ত্বেও পরিবারগুলি যদি দরিদ্র থেকে যায় তাহলে তা শ্রমবাজার কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগকে টেকসই হতে দেয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অনুসরণীয় সফল আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব উদাহরণ অনুসরণ করে জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বাংলাদেশের বর্তমান অভিগমনকে সংহত করার উপায় সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনচক্রকালে বাংলাদেশের নাগরিকদের যা প্রয়োজন তার প্রতিবিধানের পদক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। আলোচিত প্রস্তাবগুলির বেশিরভাগই চলমান কর্মসূচিসমূহকে শক্তিশালী করবে এবং গত দুই দশকে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এ অধ্যায়ে অন্যান্য বিকাশমান চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিসমূহ এবং এগুলি মোকাবেলা করার কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নগরায়ণ ও দুর্যোগজনিত চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি। তবে আলোচ্য কৌশলে কেবল সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় পড়ে এমন উদ্যোগসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

জীবনচক্র ব্যবস্থায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ও সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক শুরুতেই অনুধাবন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা কেবল প্রত্যক্ষ অনুদান সহায়তা থেকেই উপকৃত হয় না, বরং শিশু তাদেরকে পরোক্ষ সহায়তা দিয়ে থাকে এমন অন্যান্য অনেক উদ্যোগও প্রত্যক্ষ সহায়তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। যেমন, বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং অন্যান্য কর্মসূচি যেগুলো শিশুর পিতা-মাতাকে শ্রমবাজারের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করে সেগুলোর সুফলও শিশুরা ভোগ করে। সুতরাং একটি কার্যকর অবসরকালীন ভাতা (বয়স্ক পেনশন) কর্মসূচি অপরিহার্য, যা প্রবীণ ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সুরক্ষা প্রদান করবে। পেনশন সুবিধার অনুপস্থিতিতে শিশুদের পিতা-মাতার অন্যতম বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায় তাদের পিতা-মাতার (অর্থাৎ শিশুর দাদা-দাদি/নানা-নানির) দেখভাল করা; কারণ অবসর পরবর্তী সময়ে তাঁরা ক্রমশ দুর্বল ও নাজুক হয়ে পড়েন। যেহেতু একই সীমিত আয়ের মাধ্যমে পিতা-মাতা ও সন্তানের দেখাশোনা করতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ে ঘাটতি দেখা দেয়।

প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বিপদাপন্নতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্যায়টি শুরু হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ২০১৫-১৬ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর) যে সকল লক্ষ্য অর্জন করতে হবে তা বর্ণনা করার মাধ্যমে। এরপরেই রয়েছে প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে চিহ্নিত চাহিদা ও বিদ্যমান ঘাটতিসমূহের উপর ভিত্তি করে জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে নাগরিকদের চাহিদা পূরণে সরকারকে যেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে সেগুলোর বিশদ আলোচনা। এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলিসহ নগরায়ণ ও দুর্যোগজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিচালন পদ্ধতির (গভর্ন্যান্স) সংস্কার এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত অন্যান্য মূল উদ্যোগসমূহ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৪.২ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিশদভাবে বলতে গেলে, "বেকারত্ব, ব্যাধি, বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে"। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদেও একই ধরনের অঙ্গীকার বিবৃত হয়েছে। "খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা লাভের সুযোগ এবং সেই সাথে বেকারত্ব, পীড়া, প্রতিবন্ধিতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণবশত জীবিকার অভাব হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে প্রত্যাশা হলো এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের পাশাপাশি বিকাশমান মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যথোপযুক্ত হবে। এছাড়াও এটি বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানে বিধৃত সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে বর্ণিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অধিকার পূরণে সহায়তা করবে। এসব অধিকার অর্জনে কমবেশি দুদশক লেগে যেতে পারে বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প এবং এ রূপকল্প অর্জনে আগামী ৫ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আরো বিশদভাবে ও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো ক্রমান্বয়ে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিটি নাগরিকের জন্য সহজলভ্য হবে এতে তাদের জন্য একটি ন্যূনতম উপার্জনের নিশ্চয়তা থাকবে । এছাড়াও, যারা বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত ও সংকটের কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যেতে পারে তাদের জন্য আলোচ্য ব্যবস্থাটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং তাদেরকে অধিকতর ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো:

বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং আগামী পাঁচ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে বেশ কিছুটা সময় লেগে যেতে পারে সে বাস্তবতা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল। তাছাড়া সরকার একটি প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

আগামী পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হবে:

সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্রমান্বয়ে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা সমাজের দরিদ্র ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম।

বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি অধিকারভিত্তিক ধারণা প্রসূত সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর (social protection floor) বিনির্মাণে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলি হলো: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক সামর্থ্য, বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মন্থরতা এবং জরুরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলিতে অতি দরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক বিপদাপন্ন অংশের উপর জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো হলো:

- সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগের অপচয় ও প্রয়োজনের তুলনায় কম মানুষকে সেবার আওতায় আনার সম্ভাবনা পরিহার করতে বিদ্যমান ইচ্ছামাফিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সর্বজনীন পদ্ধতিতে উত্তরণ।

- মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মক্ষম বয়সী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে হতদরিদ্র/ অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র্য যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

- এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদেরকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে এমন পরিপূরক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ উপার্জনের সুযোগ প্রদান ও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- সর্বাধিক বিপদাপন্ন নারীদের জন্য বিশেষ করে তাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ।

- এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, সামাজিক অবহেলা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা, ও মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।

- নগর এলাকার দরিদ্র ও বিপদাপন্ন অধিবাসী এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।
- আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।

৪.৩ সামাজিক নিরাপত্তার জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা সংহতকরণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রস্তাবনাসমূহের মূলে রয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগসমূহ। জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নকে সংহত করার মাধ্যমে এটি দারিদ্র্যের মূল কারণের উপর জোর প্রদান করে। সকল দেশই তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ পরিক্রমায় এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, এবং গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশও একইদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে, সরকার একদিকে যেমন জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত অংশের জন্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহারে সক্ষম হচ্ছে তেমনি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীকেও সহায়তা দিতে পারছে। এ কৌশলের প্রায়োগিক দর্শন হবে বৈষম্যহীনতা। এটি ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার, পেশা, অঞ্চল, জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করে এমন সকল দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগণের কাছে সহজলভ্য হবে।

কৌশলপত্রের এই অংশে শিশু, কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দুঃস্থ ও অসহায় মা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তাকল্পে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকারের প্রস্তাবনাসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ পরিণত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জনসংখ্যার এসব অংশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৪.৩.১ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। শৈশবে এবং স্কুলে যাবার সময় শিশুরা যেন নিরাপত্তা সহায়তা পায় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। শিশুদের জন্য বিনিয়োগ কেবল তাদের কল্যাণই নিশ্চিত করেনা ভবিষ্যৎ জাতিকে একটি কার্যকর ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তির যোগান দেয়। বর্তমান কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার উৎসে রয়েছে বিকাশের বছরগুলোতে তাদের জন্য অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ।

বস্তুত বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার মাধ্যমে শিশুদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে। সরকার এসব খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে এবং শিশুদেরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ অনুচ্ছেদে যেসব কর্মসূচির উপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলি হলো: (ক) শিশু বা কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য অনুদান সহায়তা; (খ) বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ; (গ) ভবঘুরে/অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য শিশু পরিচর্যা সহায়তা নিশ্চিতকরণ; (ঘ) কর্মজীবী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা এবং (ঙ) একগুচ্ছ পরিপূরক কর্মসূচি যা প্রত্যক্ষভাবে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা জোরদারকরণে সরকারের প্রস্তাবসমূহ অনুচ্ছেদ ৪.৩.৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অল্পবয়সীদের জন্য শিশু-সহায়তা

গর্ভাবস্থায় এবং জীবনের প্রথম ১,০০০ দিন শিশুর ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে তারা পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে বাকি জীবনের জন্য তা বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের শারীরিক বিকাশ যেমন ব্যাহত হয় তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ ঘটেনা। কোনো উন্নয়নাকাঙ্ক্ষী দেশই শিশুদের জীবনে একটি সুন্দর সূচনা এনে দেওয়ার বিষয়ে কার্পণ্য করেনা এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গত দুই দশকে শিশু অপুষ্টি নিরসনে বেশ ভালো অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের ৩৯ শতাংশ শিশু অপুষ্টিজনিত অপূর্ণ বিকাশের শিকার (২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী), যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অপুষ্টি মোকাবেলায় বিভিন্ন খাতের অংশগ্রহণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন; কিন্তু অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো নিম্ন আয়। দরিদ্র পরিবারগুলো মা ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না বিধায় তাদেরকে নির্ভর করতে হয় নিম্ন পুষ্টিমানসম্পন্ন কম মূল্যের খাদ্যের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, শিশু সহায়তা কর্মসূচিগুলো শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করে।

সুতরাং সরকার ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সহায়তা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বর্তমান সহায়তাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এটি 'শিশু সহায়তা' নামে পরিচিত। এই কর্মসূচিটি স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য চলমান মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণিভুক্ত ০-৪ বছর বয়সী দেশের সকল শিশুর প্রায় অর্ধেককে নগদ অর্থ-সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রতি মাসে প্রতিটি শিশুকে এ নগদ সহায়তা[১১] প্রদান করা হবে যা শিশুর মা বা মহিলা প্রতিপালনকারীকে দেওয়া হবে। তবে মহিলা প্রতিপালনকারী না থাকলে একজন পুরুষ প্রতিপালনকারী এ ভাতা গ্রহণ করবে। উচ্চ প্রজনন হার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে একজন মা কেবল দুটি সন্তানের জন্য এ সহায়তা পাবেন।

প্রাক্কলন অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে জনসংখ্যায় কমবয়সী শিশুদের অংশ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ ০-৪ বছর বয়সী শিশু, এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এ হার কমে প্রায় ৭ শতাংশে দাঁড়াবে। ফলে সামনের দিনগুলোতে সরকার সহায়তার পরিমাণ এবং অনুদান প্রাপ্তির বয়স উভয়ই বাড়াতে সক্ষম হবে। সুতরাং ২০২০ সালে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনার অংশ হিসেবে, সরকার শিশু সহায়তার ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে এবং যোগ্যতার বয়স ও অনুদানের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

আয় সৃজনমূলক অনুদান একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায় হলেও অপুষ্টি সমস্যা নির্মূলে গর্ভবতী মহিলা, কমবয়সী শিশু ও শিশুর মায়েদের সহায়তাকল্পে আরও অনেক কর্মসূচি হাতে নেয়ার গুরুত্ব সরকার অনুধাবন করে। একল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে প্রদেয় সহায়তার সম্প্রসারণ, সামাজিক অনুদানের পরিপূরক হিসেবে মাধ্যমিক স্তরের মেয়ে শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের জন্য একটি অধিকতর কার্যকর সাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম চালু করা এবং পানি ও স্যানিটেশন সেবার উন্নয়ন ইত্যাদি। চরম অপুষ্টির শিকার শিশুদের কল্যাণে নিরাময়মূলক খাদ্যপ্রদান (থেরাপেটিক ফিডিং) কর্মসূচিসমূহ জোদারকরণের প্রচেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখবে।

নবপ্রবর্তিত শিশু সহায়তা কর্মসূচির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি বিশদ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করবে। যেসব এলাকায় শিশু অপুষ্টির হার সর্বোচ্চ সেসব এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু করবে।

বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি জোরদারকরণ

বর্তমানে শিশুদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী রয়েছে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে। প্রধানত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় তারা এই সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রায় ১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী এ উপবৃত্তি পেয়ে থাকে যার অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭ শতাংশ (বিদ্যালয়গামী) শিশু এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত। অবশ্য অর্থমূল্যে বৃত্তির পরিমাণ খুব কম এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। ফলে অনেক পরিবারের পক্ষে দারিদ্র্য মোকাবেলায় এ অর্থ খুব বেশি অবদান রাখতে পারছেনা। এছাড়া কোন পরিবারে একজনের বেশি উপবৃত্তি পেলে অনুদানের পরিমাণ কমে যায়।

উপবৃত্তি কর্মসূচিতে সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবে। কোনো জেন্ডার বৈষম্য না করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অতি দরিদ্র শিশুদের ৫০ শতাংশকে কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। নগদ অর্থ সহায়তার পরিমাণও বর্তমানের তুলনায়[১২] বৃদ্ধি করা হবে এবং একের অধিক শিশু রয়েছে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ কমানো হবে না। অবশ্য পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ দুজন শিশু এ উপবৃত্তি সুবিধা লাভ করবে। এছাড়া মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে প্রতি বছর সহায়তার পরিমাণ পুনর্নির্ধারিত হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের স্ব স্ব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপবৃত্তির জন্য বিশদ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের নিকট উপস্থাপন করবে। সংশোধিত কর্মসূচিটি ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হবে।

বাবা/মা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য শিশু পরিচর্যা সহায়তা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে বাবা বা মা কর্তৃক পরিত্যাক্ত হবার ফলে শুধু বাবা বা শুধু মায়ের নিকট প্রতিপালিত হয় এমন শিশুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সন্তান পরিত্যাগকারী অভিভাবক তার সন্তানের দায়িত্বভার বহনে অনাগ্রহী থাকে। এমন বিচ্ছিন্ন

[১১] ব্যয়ের উদ্দেশ্যে 'সহায়তার আকারের অনুমান' অধ্যায় ৫-এ বিধৃত হয়েছে এবং এ সকল সহায়তা মূল্যস্ফীতি ঘটাতে পারে।

[১২] ব্যয়ের উদ্দেশ্যে 'সহায়তার আকারের অনুমান' অধ্যায় ৫-এ বিধৃত হয়েছে এবং এ সকল সহায়তা মূল্যস্ফীতি ঘটাতে পারে।

পরিবারগুলি অধিকতর দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকে কারণ শিশু পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের ফলে কাজের সন্ধান করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই একসাথে বসবাস করুক বা না করুক মা ও বাবা উভয়কেই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে হবে। কোনো বাবা বা মা যে সন্তান পালনের দায়িত্ব অস্বীকার করে তা আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কারণ এতে তাদের সন্তানের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

২০১৫ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু প্রতিপালনে মা-বাবার অংশগ্রহণের প্রচলিত ধারার পর্যালোচনা করবে এবং পরিত্যক্ত সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণে মা-বাবার আইনগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণের সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রস্তাব করবে। ২০১৬ সালের জুন মাস নাগাদ সরকার আইন প্রণয়ন করবে যা সন্তানের প্রতি সকল মা-বাবার আইনগত ও আর্থিক দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। শিশু প্রতিপাপলনকারী (মা বা বাবা) যাতে পরিত্যাগকারীর (বাবা বা মা) কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে সক্ষম হয় এই আইনে তার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও, প্রতিপালনকারীর দাবী আদায়ে রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানের উপায়ও নির্ধারণ করা হবে। ২০১৭ সাল থেকে এ নীতিমালার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

যদি সকলকে আর্থিক দায়িত্ব বহনে বাধ্য করা যায় তাহলে তা শিশু দারিদ্র্য মোকাবেলায় একটি বড় পদক্ষেপ হবে। প্রতিপালনকারী (মা বা বাবা) যদি অন্যপক্ষের (বাবা বা মা) কাছ থেকে সুষ্ঠু ও ন্যায্য আর্থিক প্রতিকার পেতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের জন্য অধিকতর কার্যকরভাবে শ্রমবাজারে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ তৈরি হবে এবং শিশু প্রতিপালনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

শিশুদের জন্য পরিপূরক কর্মসূচি

চলমান কর্মসূচিসমূহের মধ্যে যেগুলো শিশুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক সুবিধা প্রদান করবে সেগুলো জোরদার করার প্রচেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা।
- শিশু শ্রমিক ব্যবহারের হার কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অধীন শিশু সহায়তা এবং কর্মোপযোগীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচির সহায়তায়)।
- অনাথ শিশুদের জন্য যেমন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত অর্থের। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চলমান কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে তাদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাইলট ভিত্তিতে স্কুল চলাকালীন খাবার প্রদান (স্কুল মিলস) কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির মূল্যায়ন ফলাফল থেকে দেখা গেছে শিশুরা এ কর্মসূচি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুষ্টি সুবিধা পেয়ে থাকে। এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে। খাবার তৈরিতে মাতৃসংঘকে (মাদার্স ক্লাব) সম্পৃক্ত করার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হবে।
- অন্যান্য সহায়তামূলক কর্মসূচি যেমন বিনামূল্যে বই সরবরাহ ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে।

৪.৩.২ কর্মোপযোগীদের জন্য (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ) কর্মসূচি

সরকার বিশ্বাস করে যে কর্মক্ষম বয়সী সদস্য আছে এমন পরিবারগুলির জন্য দারিদ্র্য মোকাবেলার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। সুতরাং কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য নেয়া বেশির ভাগ উদ্যোগই হলো শিক্ষা ও শ্রমবাজারকেন্দ্রিক কার্যক্রম। এগুলি গতানুগতিক সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা নয়।

বাংলাদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এই তরুণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এদের অনেকেই বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া; অবশ্য এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করলেও বেকার বা প্রায় বেকার। এক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পর তরুণ ছেলেমেয়েদের শ্রমবাজারে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জনে সক্ষম করা। এটি সরকারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতির একাট দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচেষ্টা প্রদান করছে। সরকার দেশের তরুণ ও যুবকদের শ্রমবাজারে প্রবেশে সহায়তাকল্পে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য দাতাসংস্থা ও এনজিওদের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষায়িত (ফোকাসড) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে।

সরকার শিশুদের মা-বাবাদের শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করবে এবং তাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসা-উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সহায়তা প্রদানও অব্যাহত থাকবে। তৃতীয় অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কর্মোপযোগী পরিবারগুলোর জন্য শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা বা কেবলমাত্র শ্রমবাজারে প্রবেশ সহায়তা

প্রদানের ব্যবস্থা নয় বরং একাধিক রকমের সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবারগুলির জন্য কার্যকর আর্থিক সেবা সহায়তা, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নানাপ্রকার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হতে সুবিধা প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে হবে। বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত সহায়ক উদ্যোগসমূহকেও সরকার উৎসাহিত করবে। বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থাকে দরিদ্রবান্ধব করতে সরকার প্রভাবকের ভুমিকা পালন করবে যাতে করে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সহায়ক পরিবেশের আরো উন্নত হয়। এ ধরনের উদ্যোগ ছাড়া চাকুরি ও কর্মের সুযোগ সীমিত থেকে যাবে।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় করতে সরকার ও এনজিওদের মধ্যে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি নগদ অর্থ সহায়তামূলক ও সম্পদ হস্তান্তরমূলক কার্যক্রম চালু রয়েছে যেগুলোকে সাধারণভাবে উত্তরণমূলক কর্মসূচি নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। অবশ্য, এসব কর্মসূচির সফলতা ও টেকসহিতা তখনই জোরালো হয় যখন এগুলোর মাধ্যমে উত্তরণকৃত উপকারভোগীরা আয়ের স্বীকৃত মানদণ্ড অতিক্রমের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত ও নিশ্চিত অনুদান সহায়তা লাভ করে।

এই অধ্যায়ের এ অংশে কর্মোপযোগী পরিবারসমূহের জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক সহায়তার অগ্রাধিকারসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে আগামী পাঁচ বছরে সহায়তা লাভের উপযুক্ত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে না। অবশ্য অধিকাংশ দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার জীবনচক্রভিত্তিক অন্যান্য কর্মসূচি থেকেও অনুদান সহায়তা পেতে থাকবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার দুঃস্থ মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে।[১৩] এর পাশাপাশি সরকার সাময়িক কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে এবং বেকারত্ব বিমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কর্মোপযোগী ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের জন্য সহায়তা

একাকী নারীরা (সিঙ্গেল উইমিন) বিশেষ করে কিশোরী বালিকা ও কিশোরী মায়েরা হচ্ছেন জনসংখ্যার সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত অংশ। সুতরাং সরকার ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদেরকে, বিশেষ করে একাকী মায়েদেরকে (সিঙ্গেল মাদার), সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করছে। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ হবে এসকল নারীদের জন্য ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান এবং শ্রমবাজারে সম্পৃক্ত হতে এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মা ও বাবা উভয়েই যাতে সন্তান প্রতপালনের দায়িত্ব নেয় তা নিশ্চিত করারও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

কর্মোপযোগী ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য দেশে ইতোমধ্যেই অনেক কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো বিধবা, দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় আসা নারীরা জনপ্রতি মাসে ৩০০ টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন। ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলারা প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্যশস্য পান। তবে এছাড়াও অনেক মহিলা এখন নগদ টাকায়ও সহায়তা পাচ্ছেন । ভিজিডি সহায়তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সহায়ক কর্মসূচি।

সরকার বিধবা, দুস্থ ও অসহায় মহিলা ভাতা এবং ভিজিডি কর্মসূচিকে একীভূত করে একটি নতুন দুস্থ মহিলা ভাতা (ভালনেরাবল উইমিন'স বেনেফিট) কর্মসূচি তৈরি করবে। প্রায় ৩.২ মিলিয়ন মহিলা এ নতুন কর্মসূচির আওতায় আসবে এবং মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে তাদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।[১৪] উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে দারিদ্র্য ও বিপদাপন্নতা ছাড়াও ব্যাপকতর বাছাই পদ্ধতির (এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে) অংশ হিসেবে প্রণীত মানদণ্ডের ভিত্তিতে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত দুস্থ নারী সহায়তা (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করবে।

এর বাইরেও, চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে দক্ষতা উন্নয়ন ও ব্যবসা-উদ্যোগ সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে।[১৫] বর্তমানে ভিজিডি কর্মসূচি ও উত্তরণ প্রক্রিয়ার আওতায় অনুসৃত পদ্ধতিতে সরকার প্রতি বছর ৫ লাখ মহিলা ও কিশোরী মেয়েকে দুবছরের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ সহায়তা প্রদান করবে।

মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা

গর্ভকালীন সময়ে মাতৃস্বাস্থ্যের সাথে শিশুস্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সরকার মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচির ইতিবাচক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সকল মহিলাকে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে একটি পর্যায়ভিত্তিক অভিজ্ঞতানির্ভর প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। সেই লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৫ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও ব্যয়বিভাজনসহ একটি বিশদ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করবে। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ কর্মসূচির পরিচালন অব্যাহত থাকবে। এ মন্ত্রণালয় যোগান সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করবে যাতে করে কোনো অপূরণকৃত চাহিদা থেকে না যায়।

[১৩] এ উদ্যোগটি অনেক মন্ত্রণালয় ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় হতে পারে ।

[১৪] ব্যয়ের উদ্দেশ্যে 'সহায়তার আকারের অনুমান' অধ্যায় ৫-এ বিবৃত হয়েছে।

[১৫] এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের একটি উদ্যোগ হতে পারে।

মাতৃত্ব বিমা

অনেক দেশেই নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকল্পে মাতৃত্ব সুবিধা প্রদান করা হয় এবং এর ফলে কর্মজীবী নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার পর ছুটি নিতে পারেন। মাতৃত্বকালীন বেতনের জন্য তিন ধরনের অর্থায়ন ব্যবস্থা রয়েছেঃ সরকার দায়িত্ব নেবে; নিয়োগকর্তা দায়িত্ব নেবে এবং মাতৃত্বকালীন বিমা সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগকর্তার সাথে যৌথভাবে কর্মী নিজেই দায়িত্ব নেবে।

একটি নতুন জাতীয় সামাজিক বিমা স্কীমের অধীনে সরকার সকল নতুন মায়েদের মাতৃত্ব বিমা প্রদানের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে (অনুচ্ছেদ ৪.৩.৩ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)। এ পদ্ধতির সূচক ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হবে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রণয়নের সময়। তবে সরকারের লক্ষ্য হবে সকলের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন বিমা ভাতার ব্যবস্থা করা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যই মাতৃত্ব বিমার প্রিমিয়াম প্রদানে বাধ্য থাকবে। প্রিমিয়াম পরিশোধের ভার কেবল নারীদের উপর চাপানো হলে তা যেমন নারী শ্রমিকের ব্যয় বাড়াবে তেমনি নারী কর্মী নিয়োগে মালিকদেরকে নিরুৎসাহিত করবে। কর্মী ও নিয়োগকর্তা উভয় পক্ষই এ বিমায় অবদান রাখবে।

আনুষ্ঠানিক খাতে মহিলা কর্মীদের জন্য শিশুপরিচর্যার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নারীরা, বিশেষ করে কারখানা শ্রমিক হিসেবে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তবে সন্তান জন্ম দেয়ার পর অনেককেই চাকুরী ছেড়ে দিতে হয় কেননা কাজের সময় তাদের সন্তানদের দেখাশোনার জন্য কেউ থাকে না। দেখা গেছে যে, বেসরকারি খাতের অনেক নিয়োগকর্তারই এ ধরনের সেবা প্রদানের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে। বস্তুত, এধরনের সেবা থেকে তাঁরা নিজেরাও উপকৃত হবেন কারণ এতে করে তাঁরা দক্ষ শ্রমিকদেরকে ধরে রাখতে সক্ষম হন।

শ্রম আইন ২০০৬ এ বলা হয়েছে যে, ৪০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানই পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের শ্রমিকের শিশু সন্তানদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করবে। প্রতিষ্ঠানগুলো এককভাবে নিজেরাই বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে এধরনের সেবার ব্যবস্থা করতে পারে। শ্রম আইনের এ বিধান বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করবে।

যেহেতু এ ধরনের বিধান সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য সেহেতু বেসরকারি খাতের নারী ও পুরুষ কর্মীদের মতো সরকারি কর্মচারীরাও যেন একই ধরনের সুবিধা ভোগ করে সরকার তা নিশ্চিত করবে। কাজেই শ্রম আইনের আলোকে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সকল সরকারি অফিসেই শিশু পরিচর্যা সুবিধাদি রাখা নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কর্মসৃজনমূলক (ওয়ার্কফেয়ার) কর্মসূচিসমূহ একীভূতকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রাম এলাকায় উন্মুক্ত ও মৌসুমী বেকারত্ব মোকাবেলায় বেশ কয়েকটি সাময়িক কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচি চালু রয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে ও অপচয় (লিকেজ) কমাতে বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতায় বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও সংহত করা হবে। আশা করা হচ্ছে, বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির একীভবনের ফলে প্রশাসনিক ব্যয় ও অপচয় কমানোর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জিত হবে। যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান প্রতিষ্ঠান তারা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জুলাই ২০১৮ সাল নাগাদ এ সংস্কার সম্পন্ন করা হবে।

বেকারত্ব বিমা

সফল অর্থনীতির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো নমনীয় শ্রমবাজারের উপস্থিতি যা শ্রমিকদেরকে যেসকল খাত পতনের দিকে যাচ্ছে সেসকল খাত থেকে বিকাশমান খাতে অভিগমনের সুযোগ দান করে। অবশ্য, একটি নমনীয় শ্রমবাজার কেবল তখনই সম্ভব যখন চাকরি হারিয়েছে বা হারানোর শংকায় রয়েছে এমন কর্মীদের সহায়তা করার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিমের অংশ হিসেবে (অনুচ্ছেদ ৪.৩.৩ দ্রষ্টব্য) সংগঠিত বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য বেকারত্ব ভাতা ব্যবস্থা চালু করবে। এ বিমার সম্পূর্ণ অর্থায়ন করবে নিয়োগকারী ও কর্মীগণ।

এ বিমা ব্যবস্থা একবার সংহত হলে দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এর আওতা বিস্তৃত হবে। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাতেও বেকারত্ব বিমা চালুর প্রচেষ্টা থাকবে।

৪.৩.৩ বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬.৮ শতাংশ ছিল ষাটোর্ধ্ব বয়সী এবং ২০২৬ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১০ শতাংশের প্রান্তসীমায় পৌছাবে। এই সীমায় অবস্থানকারী বা এটি অতিক্রমকারী দেশসমূহ সাধারণভাবে বার্ধক্যে উপনীত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ২০৫০ সাল নাগাদ ষাটোর্ধ্ব বয়সী মানুষের সংখ্যা হবে মোট জনগোষ্ঠীর ২৩ শতাংশ। তদুপরি, ২০৩০ সালে ৫০ উর্ধ্ব ব্যক্তিরা হবেন মোট জনগোষ্ঠীর ৩২ শতাংশ এবং ২০৫০ সালে নাগাদ যা বেড়ে গিয়ে ৪৬ শতাংশে দাঁড়াবে।

দেখা গেছে, বয়স্ক মানুষদের দেখভাল করার প্রথাগত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এছাড়া বয়স্ক নাগরিকদের অনেককে অভিবাসীদের সন্তানদের দেখাশোনা করার মত বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো একটি খানায় একজন বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি দারিদ্র্যের একটি উত্তম নির্দেশক। বয়স্ক পুরুষদের তুলনায় বয়স্ক নারীরা বেশি দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকেন। নারীদের বেলায় দারিদ্র্য ঝুঁকির হার পুরুষদের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া অনেক কর্মজীবী পরিবার তাদের বয়স্ক আত্মীয় স্বজনের দায়িত্বভার বহন করে যার ফলে তাদেরকে সন্তানদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করে বয়স্ক আত্মীয়দের জন্য খরচ করতে হয়। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য এ সমস্যা প্রকট।

কোনো সমাজকে মূল্যায়ন করার একটি ভাল উপায় হলো সে সমাজের বয়স্ক নাগরিক পরিষেবার মান যাচাই করা। বাংলাদেশের সংবিধানে বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সব নাগরিককে শেষ বয়সে বঞ্চনা-দুর্দশা থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করা জরুরি। বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা বাংলাদেশ সরকারের একটি নিঃশর্ত অগ্রাধিকার।

বিষয়টি মনে রেখেই বয়স্ক নাগরিকদের জন্য একটি জাতীয় নীতি পাশ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৬৩ বছর উর্ধ্ব নারী ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব পুরুষদের মাসে ৩০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নারী-পুরুষ এ ভাতা পাচ্ছেন যদিও তাদের এক-তৃতীয়াংশের বয়স নির্ধারিত সীমার নীচে। এর মানে অনেক যোগ্য বয়স্ক নাগরিক বাদ পড়ে যাচ্ছে। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা প্রদান করে। আবার বিধবা ভাতা গ্রহীতাদের অনেকেই বয়োবৃদ্ধ। এছাড়া সরকার প্রায় ৪ লাখ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে অবসরকালীন পেনশন প্রদান করে।

দেখা গেছে, এসব কর্মসূচি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়স্ক নাগরিক (প্রায় ৭০ শতাংশ) কোনো ধরনের আয় নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে যুক্ত নন। তাছাড়া, মাসে মাত্র ৩০০ টাকা বরাদ্দ বয়স্কদের আয় নিরাপত্তা প্রদানে খুবই সামান্য। বস্তুত বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় তা মাথাপিছু জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিশ্বে সর্বনিম্ন।

সুতরাং, আলোচ্য কৌশলপত্রে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং একই সঙ্গে কর্মোপযোগী পরিবারসমূহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে যার ফলে তারা বৃদ্ধবয়সে অধিক পরিমাণে অবসরভাতা পেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বড় তহবিল গঠিত হবে যা ব্যবসা-উদ্যোগে বিনিয়োগের পাশাপাশি জাতিগঠনমূলক কাজেও লাগানো যেতে পারে।

বয়স্কদের জন্য প্রস্তাবিত তিন স্তরবিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা:

- **প্রথম স্তর:** সরকার অর্থায়িত সুবিধা যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।
- **দ্বিতীয় স্তর:** বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কর্মীদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন কর্মসূচি চালু।
- **তৃতীয় স্তর:** বেসরকারি খাত পরিচালিত স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক (ভলান্টারি) পেনশন কর্মসূচি (কখনো কখনো কর্মসংস্থানভিত্তিক স্কিম); কোন নাগরিক বার্ধক্যকালে অতিরিক্ত আয় সহায়তা পেতে ইচ্ছুক হলে এটি গ্রহণ করতে পারে।

প্রস্তাবিত পেনশন মডেল তিন ধরনের পেনশনের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করবে। বয়স্কদের এক বিরাট অংশ হয় দরিদ্য নতুবা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাদের অনেকেই দুর্বল হয়ে পড়ায় কাজ করতে অক্ষম। সরকার চলমান বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি বুনিয়াদি স্তর (প্রথম স্তর) প্রতিষ্ঠা করবে। দ্বিতীয় স্তরটি হবে নতুন সামাজিক বিমা পেনশন,

যা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর। সরকার তৃতীয় স্তর হিসেবে কর্মসংস্থানভিত্তিক স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক বেসরকারি পেনশনের প্রসার উৎসাহিত করবে। প্রথম দুটি স্তর এক ধরনের পেনশন-যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্ত হবে এবং এর মাধ্যমে যারা বাধ্যতামূলক সামাজিক বিমা পেনশন পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে সরকার অর্থায়িত পেনশন সুবিধা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করবে। পেনশন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম স্তর: বয়স্ক ভাতা

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে:

- বাংলাদেশের ষাটোর্ধ্ব বয়সী[১৬] সকল নাগরিক যারা আয় মানদণ্ড পূরণ করে (উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ১.২৫ গুণের কম আয়) তারা এ ভাতা পাবেন।

- বয়স্ক ভাতার পরিমাণ কত হবে তা নির্ধারণ করবে সরকার।[১৭] এটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে বয়স্ক ভাতার বর্তমান পরিমাণ চলতি মূল্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হবে, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের পেনশন কর্মসূচিতে প্রদত্ত পরিমাণের তুলনায় মাঝারি।

- সরকারের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে বয়স ৯০ বছর হলে ভাতার পরিমাণ আবারও বাড়ানো যেতে পারে। এতে খরচের পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা কম হলেও বয়স্কদের যত্ন নিতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এতে স্বাস্থ্যগত খরচ কমানোর মাধ্যমে সরকার জাতীয় সঞ্চয় বাড়াতে পারে।

অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকার লাভের সুযোগসহ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির (প্রক্সি মিনস টেস্ট) উপর ভিত্তি করে আয় যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে এবং কমিউনিটির মাধ্যমে যাচাই করা হবে। যারা মনে করে যে আয়-যোগ্যতা নির্ণয়ে ভুল হবার কারণে বা লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার (ডকুমেন্টেশন) প্রমাদের কারণে তারা বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেননা তাদের জন্য সরকার একটি আপিল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়া যারা পেনশন পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেদের প্রকৃত বয়স গোপন করবে তাদের জন্য সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে ব্যয়িত অর্থের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে। এটি প্রত্যাশিত যে, অন্যান্য দেশে এধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বয়স্ক মানুষেরা যেসব অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন (যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি) বাংলাদেশেও তেমনটি ঘটবে। এছাড়া যৌথ পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে শিশুদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশা করা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পছন্দ করেন। ফলে কর্মজীবী পরিবারগুলি তাদের সম্পদের একটি বড় অংশ নিজেদের সন্তানদের জন্য ব্যয় করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় স্তর: জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম

ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উপায় হিসেবে সরকার জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম প্রবর্তনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। মালিক ও কর্মী উভয়পক্ষের অংশগ্রহণের (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান) মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক বিমা তহবিল গঠিত হবে। এ তহবিল থেকে পেনশন প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রেও (প্রতিবন্ধিতা, অসুস্থতা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা/জখম, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব) সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদেরকে (যাদেরকে তুলনামূলকভাবে সহজে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা যাবে) এ বিমার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পর্যায়ক্রমে অনানুষ্ঠানিক খাতেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। শুরুতে এটি অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন নবগঠিত বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক (আইডিআরএ) পরিচালিত হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং আইডিআরএ এর সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে এবং বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সামাজিক বিমা পরিকল্পের নকশা (গঠন ও কার্যবিধি) প্রণয়ন করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অতিদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মূলত বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। অবশ্য মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের সাথে সাথে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বিমার উপরও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের একটি মূল উপাদান হলো জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম এবং এটি বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড় ভূমিকা পালন করবে। আওতা ও পরিধির সম্প্রসারণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এটি সার্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে অবদান রাখবে।

[১৬] ডিসেম্বর ২০১৩-এ মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা অনুযায়ী ষাটোর্ধ্ব বয়সীদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

[১৭] ব্যয়ের উদ্দেশ্যে 'সহায়তার আকারের অনুমান' অধ্যায় ৫-এ বিধৃত হয়েছে এবং এ সকল সহায়তা মূল্যস্ফীতি ঘটাতে পারে।

তৃতীয় স্তর: স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক বেসরকারি পেনশন

যারা বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত সহায়তা বা বাড়তি নিরাপত্তা পেতে চায় এবং এজন্য নিজেরাই পেনশন তহবিলে অর্থ প্রদানে ইচ্ছুক তাদের জন্য বেসরকারি পেনশনের প্রসারকে সরকার উৎসাহিত করবে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসাবে বেসরকারি পেনশন কর্মসূচির প্রসারকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায় এবং এরূপ স্কিমে এর সদস্যদের বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিদ্যমান বেসরকারি পেনশন কর্মসূচিসমূহের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সমীক্ষায় একটি পেনশন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা হবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে বেসরকারি পেনশন কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহের শুদ্ধতা, ন্যায্যতা ও আর্থিক টেকসহিতা নিশ্চিত করা। অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এই সমীক্ষা পরিচালনা করবে।

৪.৩.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার "কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি" অনুসমর্থন করে, যা প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ৫ বছর মেয়াদকালে তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা কঠিন। কাজেই এজন্য সরকার বড় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (প্রতিবন্ধী সহায়তার বিদ্যমান ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে)।

আগামী ৫ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান সহায়তাগুলিকে একীভূত ও সংহত করে জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতির সাথে সমন্বিত করবে। প্রতিবন্ধীদের সহায়তাকল্পে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটি চিত্র ৪.২ -এ দেখানো হয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তিনটি মূল কর্মসূচি হলো:

- ১৮ বছর বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা;
- ১৯-৫৯ বছর বয়সী মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা;
- ৬০ বছর বয়সে মারাত্মক প্রতিবন্ধীরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।

চিত্র ৪.২: প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

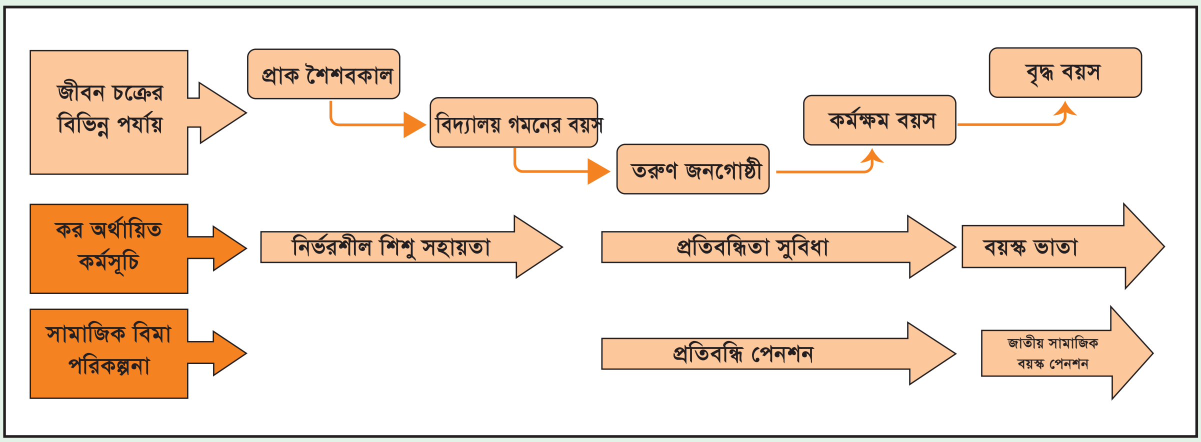

বয়স্ক ভাতা ব্যতীত এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সরকার অর্থায়িত দুটি মূল কর্মসূচি নিম্নে বর্ণিত হলো:

শিশু-প্রতিবন্ধী সুবিধা

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাই সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত। মারাত্মক প্রতিবন্ধী হিসেবে শণাক্তকৃত শিশুদের প্রত্যেকেই যেন শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা নামে পরিচিত নিয়মিত সহায়তা পায় সরকার তা নিশ্চিত করবে। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত চলমান শিশু প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। শিশুরা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করবে এবং তাদের প্রতিপালনকারীদের আয় কর্মসূচির নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশুই প্রতিবন্ধী সুবিধা প্রাপ্য হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে সরকার শিশুদেরকে একটি অনুদান সহায়তা প্রদান করবে যার পরিমাণ হবে বয়স্ক ভাতার সমতূল্য। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও প্রতিবন্ধীদের পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে সরকার ভাতার পরিমাণে তারতম্য করতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি ভেদে বিশেষ অবস্থায় করণীয় নির্ধারিত হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, দেশের ৩,৫০,০০০ শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। শিশুর মহিলা প্রতিপালনকারীকে প্রতিবন্ধী সুবিধার টাকা প্রদান করা হবে। অবশ্য যেক্ষেত্রে পুরুষ সেবাদানকারী ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিপালনকারীকেই এ অর্থ দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা শিশুকেন্দ্রিক অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তিরও সুযোগ পাবে।

সরকার মারাত্মক প্রতিবন্ধী শিশু শণাক্তকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, যা কেবল শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের নয়, অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার (যেমন অটিজম, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা, ইন্দ্রিয় বৈকল্য ইত্যাদি) শিশুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। সরকার আয় সীমার নীচে থাকা পরিবারগুলোকে শণাক্ত করার পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠা করবে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

শিশু প্রতিবন্ধী ভাতা প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার সকল দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুকে শণাক্ত করতে সক্ষম হবে। ক্রমান্বয়ে এসব শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাদেরকে অতিরিক্ত সহায়তা যেমন, সহায়ক উপকরণ, পরিবহন সহায়তা ও বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বাড়তি খরচ প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে আর ভবঘুরে ও বাস্তুহীন না থাকে তার কৌশলও নির্ধারিত হবে। শিশু প্রতিবন্ধীরা যাতে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত না হয় তা শর্ত আরোপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। শিশুদেরকে যারা ভিক্ষুক হিসেবে নিয়োজিত করে তাদের জরিমানা করার বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা কর্মসূচির অগ্রগতি পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।

কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত চলমান প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সংস্কার সাধন করে এটি পুনর্গঠিত করা হবে। এই পুনর্গঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদেরকে নিয়মিত অনুদান সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশের ২৯০,০০০ প্রতিবন্ধী বর্তমানে প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, দেশের ১.১৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম বয়সী মানুষ রয়েছে যারা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার। আয় যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী এদের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধী সুবিধা পেতে পারে। সুতরাং বর্তমান স্কিমের একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য রয়েছে এবং এ কর্মসূচি কেবল মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার কর্মক্ষম বয়সীদেরকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হবে। মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার এমন ১৯-৫৯ বছর বয়সী সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচির সুবিধা পাবে, এবং ৬০ বছর বয়সে তাদেরকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধিতা ও আয় সীমা সম্পর্কিত শর্তাদি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের শণাক্ত করতে সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতদের নালিশ ও অভিযোগ প্রতিকারের জন্য সরকার একটি আপিল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে।

যেহেতু চলমান অনুদান কর্মসূচি সংশোধিত হবে, সেহেতু প্রতিবন্ধী অনুদান গ্রহীতাদের সবাইকে পুনঃপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে যাতে করে এটা নিশ্চিত হয় যে তারা সংশোধিত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড ও শর্তাদি পূরণ করে। একটি নির্বাচন পদ্ধতিও (মিনস টেস্ট) গঠন করা হবে। প্রতিবন্ধী সুবিধা যেহেতু একটি ব্যাষ্টিক সুবিধা সেহেতু খানা বা পরিবারের আয়ের পরিবর্তে কেবল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আয়ের মূল্যায়ন করা হবে।

প্রতিবন্ধী সুবিধার আওতায় প্রদেয় ভাতার পরিমাণ বয়স্ক ভাতার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদে সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব কিনা তার পর্যালোচনা করা হবে। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবার চাহিদা বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ভাতা অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে প্রদত্ত ভাতার দ্বিগুণ বা তারও বেশি হতে পারে। সংশোধিত প্রতিবন্ধী সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হবে। তারা কার্যকরভাবে শ্রমবাজারে প্রবেশে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ প্রাপ্তিতে সক্ষম হবে। বৃত্তিমুলক শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে ভাতাগ্রহীতাদের সুযোগ নিশ্চিত করে এবং শ্রমবাজারে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূল করার মাধ্যমে ভাতাগ্রহীতাদেরকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী সহায়তার পরিপূরণ ঘটাবে।

শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা কর্মসূচি এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী সুবিধা কর্মসূচির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশদ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং অনুমোদনের জন্য (ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে) মন্ত্রিপরিষদে পেশ করবে। জুলাই ২০১৬ থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হবে।

৪.৩.৫ সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব

জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সফলতা নিশ্চিতকল্পে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ (আচরণ পরিবর্তনমূলক অনুশাসন), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইত্যাদি পরিপূরক কৌশল বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এধরনের প্রেক্ষাপট একটি সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকেও বাড়িয়ে দেয়। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অভিঘাতগুলো দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং উপরে বর্ণিত কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে যে সামান্য পরিমাণ আয়-সহায়তা বা অনুদান প্রদান করা হয়, এসব ঝুঁকি প্রশমনে তা পর্যাপ্ত নয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার বড় পরিসরের একটি স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল প্রণয়ন করেছে, যাতে দেশের সকল নাগরিকদের সমতাপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারের কৌশলসমূহের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।[১৮] এ স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি প্রধান পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

৪.৪ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়েছে যারা জেন্ডার, ধর্ম, জাতি (নৃতাত্ত্বিক পরিচয়), পেশা বা অসুস্থতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। সরকার আইনি প্রক্রিয়া ও অন্যান্য ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব গোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার বিলোপ সাধনে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এটি সরকারের ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর একটি প্রধান করণীয়। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, অন্য সবার ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীরও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির পাশপাশি সরকার প্রদত্ত অন্যান্য মৌলিক সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) প্রাপ্তির সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে যে জননীতির এই দুটি ভিন্ন ধারার যোগসূত্র স্থাপনই হচ্ছে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায়।

এসব জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যের কাছে পৌঁছাতে যে বিশেষ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন, সে বিষয়েও সরকার যথেষ্ট সজাগ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে এক্ষেত্রে গৃহীত প্রাথমিক উদ্যোগ হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের যথাযথভাবে অবহিতকরণ এবং সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদেরকে সম্পৃক্তকরণ। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূলধারায় নিয়ে আসতে একটি কার্যকর অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাও উপকারী হবে। অধিকন্তু, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (এসিড দগ্ধ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্ত, ভিক্ষুক, গৃহহীন প্রভৃতি) বিশেষ প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৫ নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। দ্রুত নগরায়ণের নানা ইতিবাচক দিক রয়েছে এবং এটি জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে নগরবাসীদের অনেকেই দারিদ্র্যের শিকার এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে, যা তাদের কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে। নগরায়ণ সমাজ জীবনে নানা ধরনের নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। নাগরিকদের কল্যাণে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাত ছাড়াও সরকারের অন্যান্য অংশের সহায়তা ও সহযোগিতার সমন্বয় প্রয়োজন।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদাকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের ৩০ শতাংশ অধিবাসী যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পায় সেখানে নগরবাসীদের মাত্র ৯ শতাংশ এ সুবিধার আওতাভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে পল্লী এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নগরে বসবাসরত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকেও অধিক হারে সামাজিক নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার প্রয়োজন সম্পর্কেও সরকার সচেতন। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী সুবিধা ও শিশু সহায়তার মতো কর্মসূচিগুলো গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় সমানভাবে গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু বয়স্ক, শিশু, দুস্থ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বিস্তৃত হচ্ছে, সেহেতু এটাও নিশ্চিত করতে হবে যেন নগরের বাসিন্দারাও এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ লাভ করে।

[১৮] "Expanding Social Protection for Health: Towards Universal Coverage", Health Care Financing Strategy 2012-2032" Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh, September 2012.

সরকার এটাও উপলব্ধি করেছে যে, আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডসমূহ নগরকেন্দ্রিক হওয়ায় শিশু পরিচর্যা এবং জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচির মতো নতুন প্রস্তাবগুলো প্রাথমিকভাবে নগর অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশি উপকার সাধন করবে। কাজেই, এসব সুবিধার আওতা সম্প্রসারিত করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য সামাজিক বিমা জাতীয় কর্মসূচিসমূহের পরিধি ও আওতা কীভাবে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করা যাবে তা নির্ধারণে সরকার ব্রাজিল ও মেক্সিকোর মতো দেশগুলোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করবে।

যাহোক, সামাজিক নিরাপত্তা নগর এলাকার জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কাজেই, দেশের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য ব্যাপকভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকার নগর পরিকল্পনা, আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও স্যানিটেশন, শিল্প নিরাপত্তা ও পরিবহন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহের উন্নয়ন ঘটাবে।

৪.৬ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহ সংহতকরণ

দেশের কোনো মানুষকে যাতে খাদ্যের অভাবে মারা যেতে না হয় সেজন্য সরকার নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহের উপর জোর প্রদান সরকারের এ মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন। অতএব, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, অন্যান্য কর্মসূচির তুলনায় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিসমূহে মোট বরাদ্দের পরিমাণ (সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি ব্যতীত) ও উপকারভোগীর সংখ্যা দুটিই বেশি। একারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এই অংশটি বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূলধারায় পরিণত হয়েছে এবং জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোতে বিশ্ব খাদ্যমূল্য সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট যৌথ ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবেলার উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও জনমিতিক কাঠামোর কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এই অংশটির গুরুত্ব যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়েও সরকার সচেতন রয়েছে। অধুনা খাদ্য দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা গেছে যে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তার চেয়ে নগদ অর্থ অধিকতর সুবিধা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: সহায়তা হিসেবে খাদ্যশস্য প্রদান (যেমন ভিজিডি); কাজের মজুরি হিসেবে খাদ্যশস্য প্রদান (যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য); দুর্যোগ ত্রাণ হিসেবে খাদ্যশস্য প্রদান (যেমন ভিজিএফ, টিআর, জিআর) এবং খাদ্যমূল্য স্থিতিশীলকরণ কার্যক্রম (যেমন খোলা বাজারে বিক্রি, ফুড কার্ড এবং ন্যায্যমূল্য কর্মসূচি)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনয় দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তীকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে। ক্ষুধা নিরসন ও খাদ্যপণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন খোলা বাজারে বিক্রি ও ফুড কার্ড কার্যক্রমের পরিধি প্রয়োজন হলে বিস্তৃত করা হবে। ওএমএস বর্তমানের মতো ব্যাষ্টিকেন্দ্রিক (সেলফ টার্গেটেড) ব্যবস্থা হিসেবেই থাকবে। ওএমএস এবং দুর্যোগ ত্রাণ হিসেবে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সরকারের খাদ্য মজুদ নীতি ও ন্যায্যমূল্য নীতির সাথে সমন্বয় করা হবে। পুষ্টি কর্মসূচি যেমন স্কুল ফিডিং এবং চরম পুষ্টিহীনতার শিকার শিশুদের জন্য নিরাময়মূলক (থেরাপেটিক) খাদ্যপ্রদান অব্যাহত থাকবে এবং এতে প্রস্তাবিত মাতৃসংঘের (মাদার'স ক্লাব) অংশগ্রহণের ব্যবস্থাও থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে সরকার সকল সাময়িক কর্মসৃজনমূলক (ওয়ার্কফেয়ার) খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিগুলিকে নগদ অর্থ প্রদান নির্ভর কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করবে। এ রূপান্তর হতে হবে সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত উপায়ে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশমালার ভিত্তিতে (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব প্রদান করবে)।

৪.৭ যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতা জোরদারকরণ

বাংলাদেশ বন্যা বা খরা ইত্যাদির মতো বড় আকারের সংকটপ্রবণ দেশ। নানা ধরনের বৈশ্বিক সংকট যেমন খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং বছর কয়েক আগেকার বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মতো বিষয়গুলি দ্বারা এ দেশ প্রভাবিত হয়ে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের অভিঘাত সহন ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের এক বৃহৎসংখ্যক নাগরিকদের বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ঘাতসহ

করে তুলবে। অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহের আওতা ও সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে এগুলি ঝুঁকির বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অর্থ প্রদানের চ্যানেল (ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) একবার চালু হয়ে গেলে যেকোনো সংকটকালে জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদানে সরকার অগ্রাধিকারমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। এছাড়া, সরকার সাময়িক ভিত্তিতে সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হবে, যা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদেরকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ক ও অনানুষ্ঠানিক তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার কারণে ভাতাগ্রহণকারী খানার বাইরেও অন্যদের নিকট এই সহায়তা পৌছাবে বলে সরকার প্রত্যাশা করে। সংকটে সর্বাধিক আঘাতপ্রবণ ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার জানতে পারবে কখন ও কোথায় অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে। ২০১৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এসব পদ্ধতির জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একসাথে কাজ করবে।

চলমান দুর্যোগ ত্রাণ সহায়তাভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের প্রস্তাবিত পর্যালোচনা থেকে যেসব সুপারিশ আসবে সেগুলো সরকারকে স্বল্পমেয়াদি মানবিক সহায়তামূলক কর্মসূচি যেমন, খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্থায়ী আবাস ও ঔষধ ইত্যাদির মতো অন্যান্য উপকরণ সহায়তা দিতে সক্ষম করবে।

সরকারে বৃহত্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধে গৃহীত কর্মসূচিসমূহকে আরও জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার জন্য শর্তযুক্ত নগদ অর্থ সহায়তার মতো কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কৃষি গবেষণা, বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্বনায়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতির মতো কর্মসূচিগুলি ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। পরিকল্পিত বদ্বীপ অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচির মতো দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিসমূহ এক্ষেত্রে আরও উপকারী হতে পারে।

কোনো বড় ধরনের সংকটের সময় সরকার সবাইকে সেবার আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না তবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রথম পাঁচ বছর শেষে আশা করা যায় যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক, বিশেষ করে সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত অংশ, বর্তমানের চেয়ে আরো ভাল ও সুদৃঢ় অবস্থানে থাকবে। ২০৩০ সাল নাগাদ একটি কার্যকর ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ত্রাণ ব্যবস্থা প্রদানে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বছর বছর এর উন্নতি সাধিত হবে।

৪.৮ বিশেষ কর্মসূচি ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ সংহতকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় অল্পসংখ্যক উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মসূচি এবং বৃহৎ সংখ্যক ক্ষুদ্র আকারের কর্মসূচি রয়েছে। বিশেষ কর্মসূচিগুলো মূলত মুক্তিযোদ্ধাগণ ও তাঁদের পোষ্যদের সহায়তা প্রদানে সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে গৃহীত। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচি চলমান থাকবে এবং এগুলিকে মুক্তিযোদ্ধা সহায়তা কর্মসূচি নামের একটিমাত্র কর্মসূচিতে একীভূত করা হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্র কর্মসূচির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কর্মসূচির বেশিরভাগই উন্নয়ন অংশীদারদের উদ্যোগে গৃহীত হয়েছে। সাধারণত সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা মোকাবেলায় নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন পাইলটিং এর মত মহৎ উদ্দেশ্যেই এসব কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। তবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল কর্মসূচিসমূহ প্রণয়নের সাথে সাথে এসব নব উদ্ভাবিত কর্মসূচির সমন্বয় ও সংযোজন ও সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে মূল কর্মসূচিগুলির উন্নয়ন সাধন করা জরুরি। অধিকন্তু, ব্যাপকভিত্তিক ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির রূপকল্পের পরিপূর্ণ কার্যকারিতার জন্য অংশীদারগণের সাথে সমন্বয় করতে সরকারের যথাযথ গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষুদ্র কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলো, যেমন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যদি তাদের কর্মসূচিগুলিকে অপরিহার্য মনে করে তবে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের নেতৃত্বে তারা বিজনেস কেস প্রস্তুত করবে। এসব কর্মসূচি কী ধরনের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে বা এগুলির মাধ্যমে কী ফলাফল অর্জিত হবে বিজনেস কেসসমূহে তার যৌক্তিকতা থাকবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিজনেস কেসের ভিত্তিতে কোন কোন কর্মসূচি অব্যাহত থাকা উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের নিকট তার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবে।

এ অধ্যায়ে যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নতুন যুগের সূচনা করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন হবে সংবিধানে বিধৃত সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিতকল্পে সরকারের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ; তবে এক্ষেত্রে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা হবে প্রাথমিক অগ্রাধিকার। এ কৌশল বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদানসহ তরুণ জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক প্রণোদনা দেবে যাতে করে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়। সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বিশেষ করে নারী প্রধান পরিবারগুলোকে ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে এবং সেইসাথে শ্রমবাজারের সাথে তাদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পূর্ণ বাস্তবায়নে আগামী দশ বছরে এখাতে ব্যাপক সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হবে। এতে অনেক কর্মসূচিকে ঢেলে সাজাতে হবে, অনেক ক্ষুদ্র কর্মসূচির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে বা অন্য কর্মসূচির সঙ্গে একীভূত করতে হবে। চরম দারিদ্র্য দূরীকরণকে সার্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল (আউটকাম) ও প্রভাব, দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির আলোকে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। এসব সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার পর বাংলাদেশ জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর ভিত্তিশীল একটি আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকারী হবে। সরকারিভাবে অর্থায়নপ্রাপ্ত এসব কর্মসূচির পরিধি ও আওতা থাকবে আরো বিস্তৃত এবং গড় সুবিধাপ্রাপ্তিও হবে উচ্চতর। এর সাথে যোগ হবে বেসরকারি খাত কর্তৃক অর্থায়িত বিভিন্ন সামাজিক বিমা ও কর্মসংস্থানভিত্তিক কর্মসূচি। এ যৌথ প্রয়াসে সৃষ্ট জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হবে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনের প্রতি বর্তমানের চেয়ে অধিকতর সংবেদনশীল। সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার যথাযথ উত্তরণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যাতে আয়ের ভিত্তিতে অযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া কোনো বিদ্যমান উপকারভোগী চলমান কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন।

পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। জীবনচক্রভিত্তিক নতুন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কর্মসূচিসমূহের প্রাপ্যতা, অনুদান সহায়তার বর্ধিত আকার ইত্যাদি সম্পর্কে সম্ভাব্য উপকারভোগীদেরকে সচেতন করতে হবে। প্রচলিত বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুনের সাথে সঙ্গতি ও ত্বরিত রূপান্তর নিশ্চিত করতে সরকারি অংশীদারগণকে সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশীল সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা হবে।

অধ্যায় ৫

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন

অধ্যায় ৫

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়ন

৫.১ সার্বিক চিত্র

একটি কৌশলপত্র বাস্তবায়নযোগ্য হতে হলে তা অবশ্যই অর্থায়নযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ের তথ্য হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তায় উচ্চতর অগ্রাধিকার দিয়েছে, যা এখাতের জিডিপি ও মোট বাজেটের শতকরা অংশ হিসাবে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির হার থেকে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তায় সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির প্রায় ২.০ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ জিডিপির শতকরা ৩.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে বাজেট সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তায় প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি করা না গেলেও এমন উচ্চ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এ খাতে সরকারের আন্তরিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

বাজেট সীমাবদ্ধতার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সম্ভাব্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিক অনুমান করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদে সরকারের বাজেট বরাদ্দ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভর করবে। রাজস্ব আহরণের অর্জিত সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক হলেও লক্ষ্য পূরণে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কারণে কিছু কর্মসূচি সরকারি রাজস্বখাতের অর্থায়ন ছাড়াও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় বণ্টনের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান সরকারি সম্পদ ছাড়াও এ কৌশলের বাস্তবায়ন বেসরকারি অর্থায়নের উপরেও নির্ভর করবে।

চূড়ান্ত বিবেচনায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার বাস্তবতা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তায় ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন ও কর্মসূচি বিস্তারের মাধ্যমে ভালো ফল প্রাপ্তির কারণে এ খাতের বিষয়ে রাজনৈতিক সমর্থন বৃদ্ধি পায়। তখন সরকারের দায়িত্ব হয়ে পড়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অর্থায়ন নিশ্চিত করা। দেশের সকল সরকারের কাছেই সামাজিক নিরাপত্তা অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের বাস্তবতার বিবেচনায় দারিদ্র্যহ্রাস এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির পরিধির বিস্তারের ইতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এটাই স্বাভাবিক যে সরকারি সম্পদের একটি বড় অংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হবে।

এ পটভূমিতে, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অর্থায়নের বিষয়াদি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে, বিশেষত বাজেট থেকে অর্থায়িত প্রতিটি কর্মসূচির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন এবং প্রাক্কলিত ব্যয়কে প্রাপ্তিযোগ্য অর্থায়নের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দ বিবেচনার পাশাপাশি প্রস্তাবিত কৌশলের অর্থায়নের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে বেসরকারি অর্থায়নে যেসকল কর্মসূচি পরিচালিত হবে এ অধ্যায়ে সেগুলির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়নি। কেননা, ব্যয় প্রাক্কলনের পূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত টাস্কফোর্সসমূহ দ্বারা এ সকল কর্মসূচির বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণা সম্পাদন করা প্রয়োজন। তদুপরি, কৌশলের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অর্থায়নের সম্ভাব্য অন্যান্য উৎস, যেমন, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর), যাকাত, অনাবাসি বাংলাদেশিদের (এনআরবি) কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আন্তর্জাতিক জনহিতৈষী তহবিল ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের সম্ভ্যাবতা যাচাই করে দেখতে হবে।

৫.২ প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহের ব্যয় প্রাক্কলনঃ বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ

অধ্যায় চারে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রস্তাবিত সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বিরাজমান দ্বৈততা পরিহার করে জীবনচক্রভিত্তিক সমন্বিত কয়েকটি প্রধান কর্মসূচি প্রণয়ন করা। কৌশলে বর্ণিত চারটি প্রধান সংস্কার প্রস্তাব নিম্নরূপ:

- সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত মূলত দারিদ্র্য ও জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করে এমন বিদ্যমান

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহকে জীবনচক্রভিত্তিক ৫টি কর্মসূচিতে সমন্বিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, প্রচলিত নিয়মের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থানকে একটি ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এ কৌশলে নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে যথাযথ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও খাদ্যমূল্য স্থিতিশীলকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে ২টি প্রধান কর্মসূচিতে একীভূত করা দরকার। এর উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচিসমূহের দ্বৈততা দূরীকরণ ও দক্ষতার উন্নয়ন করে যৌথ ঝুঁকিসমূহের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। একটি কর্মসূচি সব ধরনের কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিসকে এবং অন্যটি খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহকে সমন্বিত করবে।

- উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মসূচিগুলি, যথা- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (এমএইচভিএস), এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহ কর্মসূচি ও অন্যান্য কর্মসূচি পূর্বের ন্যায় পরিচালিত হতে থাকবে।

- যথাযথ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনীমূলক এবং বিস্তৃতির সুযোগ রয়েছে এরূপ ক্ষুদ্র আকারের পরীক্ষামূলক কর্মসূচিসমূহ সমন্বিত করা প্রয়োজন।

সারণি ৫.১ এ সংস্কার কৌশলের সারসংক্ষেপ বিবৃত হয়েছে। সারণিটিতে প্রস্তাবিত নতুন কৌশলের সাথে বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের তুলনাও দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যেমনটি চিহ্নিত করা হয়েছে, বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ করে শিশু, বিদ্যালয়গামী শিশু, দরিদ্র ও দুস্থ মহিলা ও বয়স্কদের জন্য পরিচালিত কর্মসূচি গুলিতে দুটি প্রধান সমস্যা রয়েছে। সমস্যা দুটি হলো: অধিকাংশ কর্মসূচির বিস্তৃতি আদতেই অপ্রতুল এবং এগুলি থেকে গড় সুবিধা প্রাপ্তি বাস্তবে স্বল্প। কর্মক্ষম বয়সীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহ আপাতদৃষ্টিতে পর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হলেও জীবনচক্রের এ পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও কর্মসূচিসমূহের প্রকৃতি নিয়ে উৎকণ্ঠা রয়েছে।

সারণি ৫.১: সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত জীবনচক্রভিত্তিক ও ঝুঁকি প্রশমনমূলক প্রধান প্রধান কর্মসূচি

ক. সমন্বিত জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ	বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহের ম্যাপিং
১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (<১-৪) - শিশু সহায়তা (সর্বোচ্চ ২ জন) - টিকা দান, শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন এবং আউটরিচ কর্মসূচিসমূহ জোরদারকরণ	- মাতৃ, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য - কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ
২. স্কুলগামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি - প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ - এতিমদের জন্য কর্মসূচি - পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য শিশু লালন-পালনে ভাতা	- প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার - এতিমদের জন্য কর্মসূচি
৩. ক. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি (১৯-৫৯ বছর) - শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ - বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ও মাতৃত্ব বিমার জন্য আইন তৈরি করা - কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করা	- দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন - পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর জন্য খাদ্য সহায়তা - অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি - কাজের বিনিময়ে খাদ্য - সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন - পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি - একটি বাড়ি একটি খামার - ২য় আশ্রয়ণ প্রকল্প
৩. খ. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯) - নগদ অর্থ প্রদানভিত্তিক একক ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে একত্রীকরণ - আনুষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র থাকার বাধ্যবাধকতা - মাতৃত্ব স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম - কর্মজীবী নতুন মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন বিমা	- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) - বিধবা, পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা - মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি (এমএইচভিএস)
৪. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা - বয়স্ক ভাতা (ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিকদের জন্য) - সরকারি কর্মচারীদের পেনশন (অপরিবর্তিত) - জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম চালুর উপায় অন্বেষণ করা (কন্ট্রিবিউটরি/ব্যক্তিখাতে অর্থায়িত) - স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক বেসরকারি পেনশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প অন্বেষণ করে দেখা - মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচি	- বয়স্ক ভাতা - ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন/গৃহ নির্মাণ - অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা - সরকারি কর্মচারীদের পেনশন

ক. সমন্বিত জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ	বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহের ম্যাপিং
৫. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি - শিশু প্রতিবন্ধী ভাতা (বয়স<১-১৮) - প্রতিবন্ধী ভাতা (বয়স ১৯-৫৯)	- আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান
খ. ঝুঁকি প্রশমনমূলক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ একীভূতকরণ	
৬. যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহের জোরদারকরণ - খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ওএমএস জোরদারকরণ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সমন্বিত করা	- ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) - টেস্ট রিলিফ (টিআর) - গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর) - খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)
গ. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহ	
৭. উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচিসমূহ - উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষ কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করবে - মুক্তিযোদ্ধা সুবিধা কর্মসূচি - ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্তসহ সামাজিকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি	

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় ও চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে একই ধরনের কর্মসূচিকে সমন্বিত/একীভূত করে জীবনচক্রভিত্তিক প্রধান কয়েকটি কর্মসূচিতে রূপ দেয়া ও সুবিধাভোগীদের জন্য সেবার আওতা এমনভাবে বাড়ানো যাতে কর্মসূচিগুলির কাঠামোই এমন হয় যে সেগুলিতে সব দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে ও সুবিধাভোগীদের অর্থবহ উন্নয়ন ঘটাতে কর্মসূচির গড়পড়তা সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সরকারি বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়িত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের প্রস্তাবিত ব্যয় নির্ভর করবে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য এবং প্রদেয় ভাতা/সুবিধার অনুমিত আকারের উপরে (বিস্তারিত চিত্র ৫.১ এ)।

সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের ব্যয় নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এটি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ অর্থায়ন সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হবে। সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের অর্থায়ন হলো কৌশলের সার্বিক অর্থায়নের একটি অংশমাত্র; আর অন্য অংশটির অর্থায়ন মূলত বেসরকারি খাতের সামাজিক বিমা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিধিবিধানের উপর নির্ভরশীল। কৌশলটির অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি চিত্র ৫.১ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

চিত্র ৫.১: অর্থায়ন কৌশলসমূহ

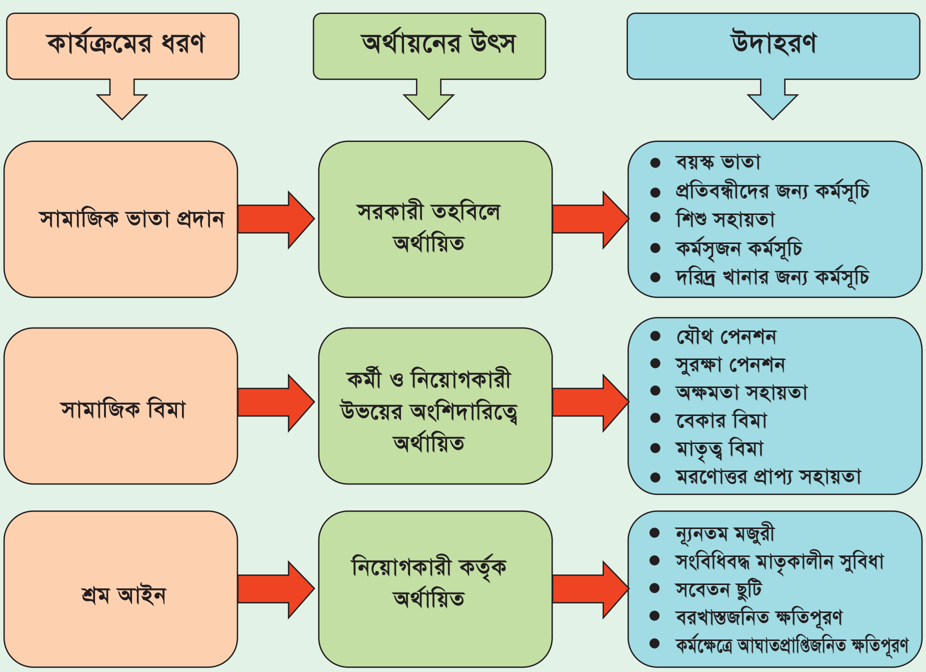

বক্স ৫.১: ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান অনুমিত সিদ্ধান্তসমূহ (দারিদ্র্য ও ঝুঁকিগ্রস্ততার উপর ভিত্তি করে): একটি উদাহরণ

১. ২০১০-২০৩০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ থেকে জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা তুলনা করা হয়েছে।

২. প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের শুরুর তারিখ হলো ২০১৫-১৬ অর্থবছর।

৩. প্রথম বছর বাস্তবায়ন হার হবে ৬০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৮০ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১০০ শতাংশ।

৪. সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণের হার হলো ৫০% (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে ১.২৫ x উচ্চ দারিদ্র্য রেখা)। এ পদ্ধতি অনুসারে প্রাক্কলিত মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা হলো ৩৫.৭ মিলিয়ন।

৫. মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয় উপবৃত্তি (ছাত্র প্রতি মাসিক ৩০০ টাকা) এবং প্রতিবন্ধী ভাতাসমূহ (ব্যক্তিপ্রতি মাসিক ১৫০০ টাকা) ব্যতীত ব্যক্তিপ্রতি প্রতি মাসে ৫০০ টাকা নগদ সহায়তা বিবেচনা করা হয়েছে।

৬. প্রাক্কলিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে গড় মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে টাকার চলতি মূল্যে ভবিষ্যৎ ব্যয় (২০১৫-১৬ অর্থবছর পরবর্তী) প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৭. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক কর্মসূচিসমূহের মোট ব্যয় হবে জিডিপির ১.০৭ শতাংশ (১৮৪.১ বিলিয়ন টাকা)।

৮. জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের বাইরে অন্যান্য কর্মসূচির (ঝুঁকি-হ্রাস, বিশেষায়িত ও ক্ষুদ্র কর্মসূচি) ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

৯. অধিকাংশ সুবিধাভোগী পরিবার দুটি বা তিনটি কর্মসূচি থেকে সুবিধা/সহায়তা পেতে পারে।

জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহ	সুবিধাভোগীর সংখ্যা (অর্থবছর ২০১৫-১৬)	মাসিক ভাতা বা সহায়তা (টাকা)	বাস্তবায়ন হার	২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)
১. বয়স্ক ভাতা	৫.৫ (১০.৮ মিলিয়নের ৫০%)	৫০০	৬০%	২০.১*
২. সরকারি কর্মচারীদের পেনশন	০.৬ মিলিয়ন			৭৬.০
৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি	১.০ (২ মিলিয়নের ৫০%)	১৫০০	৬০%	১০.৮
৪. শিশু সহায়তা	৭.৫ (১৫ মিলিয়নের ৫০%)	৫০০	৬০%	২৭.০
৫. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি	১৭.৯ (৩৬ মিলিয়নের ৫০%)	৩০০	৬০%	৩৮.৭
৬. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (দুঃস্থ মহিলা সহায়তা)	৩.২ (৬.৪ মিলিয়নের ৫০%)	৫০০	৬০%	১১.৫
মোট	৩৫.৭ মিলিয়ন			১৮৪.১

* বয়স্ক ভাতার আওতায় ৯০ বছর ও তদূর্ধ্বদের জন্য মাথাপিছু প্রতিমাসে ৩০০০ টাকা প্রদান করা হবে ধরে ০.৩ বিলিয়ন টাকা ব্যয় হিসাব করা হয়েছে।

৫.২.১ বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা

এ কর্মসূচি সংস্কারের ৪টি অংশ নিম্নরূপ:

- ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সী সকল (বয়সভিত্তিক এ দলের ৫০%) দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিককে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থমূল্যে মাসিক পেনশনের পরিমাণ হবে ৫০০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির সাথে ভাতার পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। যাদের বয়স ৯০ ছাড়িয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে মাসিক ভাতার পরিমাণ হবে ৩,০০০ টাকা।
- সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা আগের মতোই চলমান থাকবে।
- নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়ের অংশিদারিত্বের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (এনএসআইএস) চালুর সম্ভাবনা ও সুযোগ অনুসন্ধান করা হবে।
- পেশা বা কর্মসংস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন (পিভিপি) ব্যবস্থা প্রণয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হবে।

প্রথম অংশটি, অর্থাৎ বয়স্ক ভাতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থায়িত হবে। দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ সরকারি চাকুরিজীবী পেনশনের অর্থায়নও বাজেট থেকে করা হবে। অন্য দুটি অংশ, সামাজিক বিমা ও স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে।

বর্তমান জনমিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রথম বছর, অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের সংখ্যা হবে প্রায় ১১.৪ মিলিয়ন। প্রায় ০.৬ মিলিয়ন সরকারি পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত বয়স্ক ভাতা পেতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা হবে ১০.৮ মিলিয়ন। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা নির্ধারিত ভাতা/সুবিধা, আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে ১.২৫ X উচ্চ দারিদ্র্য রেখা) ৫০% সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন বিবেচনা করে ভিত্তি বছরে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৯.৮ বিলিয়ন টাকা।[১৯] নব্বই বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬,০০০ জন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আয় বিবেচনায় ৫০% সুবিধাভোগী বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ০.৩ বিলিয়ন টাকা। এভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মোট ব্যয় এই অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০.১ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২)। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধির প্রবণতা, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ১০০% বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমিত বার্ষিক গড় ৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি) উপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রক্ষেপণ (চলতি অর্থমূল্যে) করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব সারণি ৫.৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সরকারি কর্মচারিদের পেনশনের ব্যয় নির্ধারণ: এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য এ খাতের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭৬ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২)। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় সারণি ৫.৩ এ দেখানো হয়েছে।

৫.২.২ প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি

প্রতিবন্ধীদেরকে নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা হবেঃ

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারভুক্ত প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে মাসিক ১,৫০০ টাকা হারে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে।
- কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে।

অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায় বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য একই আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে কর্মসূচির ব্যয় হিসাব করা হয়েছে। অর্থাৎ, বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের ৫০ শতাংশ এ কর্মসূচির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। কর্মসূচিটি ৩ বছরে ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থাৎ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম বছরে, এ কর্মসূচিতে ব্যয় হবে প্রায় ১০.৮ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২)। এক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় চলতি মূল্যে কর্মসূচির ব্যয় হিসাব করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় সারণি ৫.৩ দেখানো হয়েছে।

[১৯] চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত কৌশল অনুযায়ী এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন শুরুর দিন থেকে ৩ বছর সময়ের মধ্যে বর্ধিত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাক্কলনের উদ্দেশ্যে ৬০% (১ম বছর); ৮০% (২য় বছর); ১০০% (৩য় বছর) হারে বাস্তবায়ন পথরেখা ধারণা করা হয়েছে। বাস্তবায়নের সময় প্রাথমিকভাবে অতি দরিদ্রদের গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫.২.৩ শিশুদের জন্য কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা ছাড়াও দুই ধরনের মৌলিক কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের শূন্য থেকে চার বছর বয়সী সকল শিশুকে মাসিক ৫০০ টাকা করে শিশু অনুদান দেয়া যেতে পারে ।

- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সকল শিশুকে মাসে ৩০০ টাকা করে বিদ্যালয়-উপবৃত্তি দেয়া যেতে পারে । শিশুদের জন্য প্রদেয় অনুদান ও উপবৃত্তির টাকা শিশুদের মায়েদের ব্যাংক-হিসাবে জমা হবে ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ৪ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ মিলিয়ন । তন্মধ্যে ৫০ শতাংশ আলোচ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত হলে এবং প্রথম বছরে কর্মসূচিটির ৬০ শতাংশের বাস্তবায়ন বিবেচনা করলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচিটির মোট ব্যয় দাঁড়াবে ২৭ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২) । প্রক্ষেপিত জনমিতিক বিন্যাস, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচিটির শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত কর্মসূচির মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে । এভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সম্ভাব্য ব্যয় সারণি ৫.৩ এ দেয়া হয়েছে ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা হবে প্রায় ৩৬ মিলিয়ন । আয় মানদণ্ডের হিসাব অনুযায়ী বয়স ভিত্তিক এই দলভুক্ত শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ সুবিধাভোগী হবে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটির ৬০ শতাংশ বাস্তবায়িত হবে এই বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচিটির মোট ব্যয় হবে ৩৮.৭ বিলিয়ন টাকা । প্রক্ষেপিত জনমিতিক বিন্যাস, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং অনুমিত গড় মুদ্রাস্ফীতির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে । ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব সারণি ৫.৩ এ প্রদর্শিত হলো ।

৫.২.৪ নারীদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অধীনে নারীরা বয়স্ক ভাতা পাবে এবং প্রাসঙ্গিক হলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবে । এছাড়াও, এ কৌশলে দুঃস্থ ও কর্মক্ষম বয়সী নারীদের (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত বিধবা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা, নারী-প্রধান খানা) বিশেষ সমস্যার কথা বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে পুনর্গঠিত দুঃস্থ/ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা সুবিধা (ভিডব্লিউবি)-এর আওতায় একটি সার্বিক আয় হস্তান্তর কার্যক্রম বাবদ মাথাপিছু মাসিক ৫০০ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে । মোট ৩.২ মিলিয়ন মহিলা এ সুবিধা পাবে । ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচিটির ৬০ শতাংশ বাস্তবায়িত হলে পুনর্গঠিত এ কর্মসূচিটিতে প্রথম বছরে মোট ব্যয় হবে ১১.৫ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২) । কর্মসূচির ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে যে ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগীর সংখ্যা মোট নারী জনসংখ্যার অংশ হিসেবে অপরিবর্তিত থাকবে, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য প্রভাব বলবৎ থাকবে । অর্থবছর ২০১৯-২০ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় সারণি ৫.৩ এ দেখানো হলো ।

প্রস্তাবিত ভিডব্লিউবি কর্মসূচি ছাড়াও কর্মজীবী নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শ্রমবাজারে নারীদের প্রবেশ সহজতর করতে সকল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাতের অফিসে শিশু সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্ব বিমা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে । কৌশলে আরও বলা হয়েছে যেসব বাবা তাদের শিশু সন্তানকে মায়ের কাছে ফেলে রেখে পরিত্যাগ করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী সন্তানের লালন-পালনের খরচ দিতে বাধ্য করার পদক্ষেপ নেয়া হবে ।

আয়যোগ্যতার মানদণ্ড ও অন্যান্য যোগ্যতার মানদণ্ড প্রয়োগ করে জীবনচক্রভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ (যখন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হবে) মোট ৩৫.৭ মিলিয়ন দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে । উপকারভোগীর সর্বমোট সংখ্যা হবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ।

৫.৩ প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও অর্থের প্রাপ্যতা

৫.৩.১ পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয়: জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমুহ পরিচালনার জন্য মোট ব্যয়

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হবে এমন জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহের মোট ব্যয় সংক্ষেপে সারণি ৫.২ এ দেখানো হয়েছে । নতুন কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম বছরে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় হিসাব করা হয়েছে ১৮৪.১ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপির প্রায় ১.০৭ শতাংশ ।

সারণি ৫.২: ভিত্তি বছর (অর্থবছর ২০১৫-১৬)-এর সরকারি তহবিলে অর্থায়িত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ

জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহ	অর্থবছর ২০১৫-১৬ এর ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	অর্থবছর ২০১৬-১৭ এর ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যয় (অর্থবছর ২০১৭-১৮) (বিলিয়ন টাকা)	অর্থবছর ২০১৭-১৮ উপকারভোগী (মিলিয়নে)
১. বয়স্কদের জন্য পেনশন				
- বয়স্ক ভাতা	২০.১	৩৫.৩	৩৭.৪	৫.৫
- সরকারি চাকুরিজীবীদের পেনশন	৭৬	৮০.০	৮৫.০	০.৬
২. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি	১০.৮	১৯.১	২০.২	১.০
৩. শিশু সহায়তা	২৭.০	৪৭.৭	৫০.৬	৭.৫
৪. স্কুলগামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি	৩৮.৭	৬৮.৩	৭২.৪	১৭.৯
৫. নারীদের জন্য কর্মসূচি				
- দুস্থ/ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা সুবিধা	১১.৫	২০.৪	২১.৬	৩.২
মোট	১৮৪.১	২৭০.৭	২৮৭.১	৩৫.৭
নমিনাল জিডিপি	১৭,১৭৬	১৯,৫১৭	২২,১৭৭	
জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির মোট ব্যায় (জিডিপির % অংশ)	১.০৭	১.৪০	১.৩০	

উৎস: এনএসএসএস প্রক্ষেপণ।

এখানে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, সরকারি চাকুরিজীবী পেনশন হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল কর্মসূচি। এটি দারিদ্র্য নিরসনমূলক কোনো কর্মসূচি নয়। এ কর্মসূচি বাবদ খরচ বাদ দেয়া হলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের মোট ব্যয় দাঁড়াবে জিডিপির ০.৬৩ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হলে সরকারি পেনশন বাদে সকল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে জিডিপির ০.৯১ শতাংশে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত ব্যয় নির্ধারণের প্রস্তাব বিভিন্ন সুবিধাভোগীর কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ (সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য পরিচালিত পেনশন ব্যতীত) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার প্রায় ৬০ শতাংশই দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলির শিশুরা পাবে। এই সামাজিক ব্যয় বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে অনুমান করা হয়েছে। একইভাবে, সকল সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান বাবদ ব্যয়কে দেশের ব্যাপকতর উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য তাই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫.৩.২ পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয়: যৌথ ঝুঁকি প্রশমন, বিশেষায়িত ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মসৃজন ও খাদ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলির মোট প্রকৃত ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে দুটি প্রধান কর্মসূচি চলমান রয়েছে: ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহ/আবাসন নির্মাণ এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী প্রদান।

এ দুটি কর্মসূচি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫.৮ বিলিয়ন টাকা ব্যয় হয় (সারণি ২.১)। এছাড়া, বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন জনগোষ্ঠী, যেমন, এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ, উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা শিশু, হিজড়া, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, চা বাগানের শ্রমিক প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় বিশেষায়িত কর্মসূচি চলমান থাকবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এসব কর্মসূচির মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়াও, তিনটি বিশেষ কর্মসূচির জন্য (মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ কর্মসূচি) ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.৩ বিলিয়ন টাকা খরচ হয়। প্রাক্কলনের সুবিধার্থে এসব কর্মসূচির প্রকৃত ব্যয় স্থির ধরা হয়েছে।

ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রেও ধারণা করা হয়েছে যে, এসব কর্মসূচির ব্যয় প্রকৃত অর্থে অপরিবর্তিত থাকবে। যদিও অনেক কর্মসূচিই সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তবে কিছু উদ্ভাবনীমূলক বা নতুনত্বপূর্ণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে এবং নতুন উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিসমূহ পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে আসতে পারে। বিলুপ্ত কর্মসূচিসমূহ থেকে যে অর্থের সাশ্রয় ঘটবে তা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) কার্যক্রমের তহবিল হিসেবে কাজ করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ব্যয় প্রাক্কলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের ব্যয় নির্ধারণে একটি বড় নির্ধারক হলো জনমিতিক বিন্যাস। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের জন্য যেসব কর্মসূচি পরিচালিত হবে সেগুলি সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করবে। বস্তুত ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে বয়স্ক ভাতা একটি প্রধান নির্ণায়কে পরিণত হবে। জন্মহার হ্রাসের কারণে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির গতি শ্লথ হওয়ায় ও গড় আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ার কারণে সার্বিক জনসংখ্যায় যে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ভবিষ্যৎ ব্যয়ের পরিকল্পনাতে সে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। জনসংখ্যাগত এরূপ পরিবর্তন পুরো একবিংশ শতাব্দী জুড়ে চলবে বলে ধারণা করা হয়েছে। উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলিতেও একই ধরনের জনমিতিক রূপান্তর চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি বাবদ অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই জনমিতিক রূপান্তরের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫.৩.৩ অর্থায়ন প্রাপ্যতা ও অর্থায়নের ভারসাম্য

বাজেটের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত সম্পদের বিবেচনায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলির ব্যয় সংকুলান হবে কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন। সারণি ৫.৩ -এ প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সম্ভাব্য পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয়কে জিডিপির শতকরা হিসেবে অপরিবর্তনশীল (জিডিপির ২.২ শতাংশ) ধরে নিয়ে অনুমিত ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।[২০] দুটি কারণে এটি একটি রক্ষণশীল অনুমান: প্রথমত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয়ে জিডিপির অংশ ২.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার হালনাগাদকৃত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনীতি কাঠামো থেকে দেখা যায় যে চলমান কর সংস্কারের অগ্রগতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি বছর অর্থাৎ ২০০৯-১০ -এর তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'তে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় ৩ শতাংশে উন্নীত করতে সহায়তা করবে। বর্তমান ধারার মতোই জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার বছরে গড়ে ৬ শতাংশ অব্যাহত থাকবে এমন অনুমানের উপরে ভিত্তি করে আলোচ্য অর্থায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণি ৫.৩: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মসূচিসমূহের ব্যয় নির্ধারণ বা কস্টিং (বিলিয়ন টাকা)

কর্মসূচি	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০
ক. জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহ					
১) বয়স্ক ভাতা	২০.১	৩৫.৩	৩৭.৪	৩৯.৬	৪২.০
২) সরকারি চাকুরিজীবী পেনশন	৭৬.০	৮০.০	৮৫.০	৯০.০	৯৫.০
৩) প্রতিবন্ধী সুবিধা	১০.৮	১৯.১	২০.২	২১.৪	২২.৭
৪) শিশু সহায়তা	২৭.০	৪৭.৭	৫০.৬	৫৩.৬	৫৬.৮
৫) শিশুদের বিদ্যালয় উপবৃত্তি	৩৮.৭	৬৮.৩	৭২.৪	৭৬.৭	৮১.৪
৬) দুস্থ মহিলা সহায়তা	১১.৫	২০.৪	২১.৬	২২.৯	২৪.২
জীবনচক্রভিত্তিক সবগুলো কর্মসূচির মোট ব্যয় (১+২+৩+৪+৫+৬)	১৮৪.১	২৭০.৭	২৮৭.১	৩০৪.৩	৩২২.১
খ. বিশেষ কর্মসূচিসমূহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
গ. যৌথ ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচিসমূহ	৯৭	১০৩	১০৯	১১৬	১২৩

[২০] এনএসএসএস বাস্তবায়নে জিডিপির অনুপাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রচলিত বাজেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই চূড়ান্ত করা হবে।

কর্মসূচি	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০
ঘ. ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ	৪২	৪৪	৪৭	৫০	৫৩
মোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	৩৩৭.১	৪৩২.৭	৪৫৯.১	৪৮৭.৩	৫১৬.১
জিডিপি (বেইস কেইস)	১৭,১৭৬	১৯,৫১৭	২২,১৭৭	২৫,২২৩	২৮,৭৩৯
জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচি (জিডিপির %)	১.০৭	১.৪	১.৩	১.২	১.১
কোভেরিয়েট ও অন্যান্য (জিডিপির %)	০.৮৯	০.৮৩	০.৮৭	০.৭৩	০.৬৮
মোট ব্যয় (জিডিপির %)	১.৯৬	২.২২	২.০৭	১.৯৩	১.৮০
ঙ. অর্থায়ন ব্যবধান (বেইস কেইস জিডিপি)					
বিদ্যমান অর্থায়ন (জিডিপির %)	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২
বিদ্যমান অর্থায়ন (বিলিয়ন টাকা)	৩৭৮	৪২৯	৪৮৮	৫৫৫	৬৩২
ভারসাম্য অর্থায়ন	(+) ৪১	(-) ৪	(+) ২৯	(+)৬৮	(+) ১১৬
ভারসাম্য অর্থায়ন (জিডিপির %)	(+) ০.২৪	(-) ০.০২	(+) ০.১৩	(+) ০.২৭	(+) ০.৪০

উৎস: এনএসএসএস প্রাক্কলন। সংশ্লিষ্ট প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে এনএসএসএস-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এই তাত্ত্বিক অর্থায়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

ভারসাম্যপূর্ণ বেইস কেইস অর্থায়ন: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বাস্তবসম্মতভাবে সংগৃহীত হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। এ দৃশ্যকল্প অনুযায়ী ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সম্পদ আহরণ খুব একটি বড় বাধা হবে না। এ প্রাক্কলনের অনুশীলন নিম্নোক্ত কারণে আশাব্যঞ্জক:

- প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা সংস্কার কর্মসূচি রক্ষণশীল অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অর্থায়নযোগ্য। প্রথম কয়েক বছর অর্থপ্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ভেতরে যে ক্ষুদ্র পার্থক্য থাকবে তা ক্রমবর্ধমান বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি দ্বারা পূরণ করা সম্ভবপর হবে। এমনকি ব্যয় যখন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবে, তথা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় যখন জিডিপির ২.২২ শতাংশ হবে তখনও তার পরিমাণ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কলনের চেয়ে কম, অর্থাৎ, জিডিপির ৩ শতাংশের নীচে থাকবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংস্কারের মাধ্যমে সৃষ্ট অতিরিক্ত সুবিধা অনেকাংশেই দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারসমূহের শিশুদের কাছে পৌঁছাবে, যা সরকারের একটি উচ্চ অগ্রাধিকার বলে বিবেচিত।

- দ্বিতীয়ত, প্রক্ষেপণ অনুযায়ী প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলটি দীর্ঘ মেয়াদে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং ক্রমহ্রাসমান তরুণ জনগোষ্ঠীর জনমিতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- তৃতীয়ত, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত মৌলিক কর্মসূচি বহির্ভূত অন্যান্য একক কর্মসূচির কার্যকারিতা নিরূপণ সাপেক্ষে বিবেচিত সফল কর্মসূচিতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ কৌশলপত্রে কর্মসূচি নির্বিশেষে সম্পদ স্থানান্তরের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

- পরিশেষে, ২০১৯-২০ অর্থবছর পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত কর্মসূচিতে প্রদেয় সুবিধায় কোনো পরিবর্তন না ঘটার কারণে বিপুল উদ্বৃত্ত গড়ে উঠবে। বার্ষিক ৭-৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দৃশ্যকল্পের ক্ষেত্রে এ উদ্বৃত্তের আকার অনেক বড় হবে। এর ফলে, দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে সরকারের পক্ষে জীবনচক্রভিত্তিক ও অন্যান্য কর্মসূচিতে প্রদেয় সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা যায় কিনা সে বিষয়ে পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও, আলোচ্য উদ্বৃত্তের প্রেক্ষিতে সরকার অতিদরিদ্র ও সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (যেমন, তরুণ সম্প্রদায়) জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারবে।

৫.৪ দারিদ্র্যহ্রাসে প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা

সমন্বিত ও পুনর্গঠিত নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য গভীরতা হ্রাসে ভালো ফলাফল অর্জিত হলেই কেবলমাত্র বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের প্রস্তাবিত পুনর্গঠন সফল বা অর্থপূর্ণ হবে। পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল/কার্যকারিতা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সিমিউলেশনের মাধ্যমে পরিচালিত অনুশীলন থেকে কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল ও কার্যকরিতা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে সিমিউলেশন ভিত্তিক এ ফলাফলকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে কারণ এগুলো নির্দেশনামূলক ও শতভাগ নির্ভুল নয়।

সিমিউলেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুমানের বাস্তব যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করা জরুরি। প্রথমত, টার্গেটকৃত সুবিধাভোগী নির্ধারণে ব্যবহৃত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি (প্রক্সি মিন্স টেস্ট) ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বর্জনজনিত ত্রুটি অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এবং পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্জনজনিত ত্রুটি ও সুবিধাভোগীর বিস্তৃতির মধ্যেকার বিপ্রতীপ সম্পর্ক চিত্র ৫.২-এ প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫০% সুবিধাভোগীর বিস্তৃতির বিপরীতে বর্জনজনিত ত্রুটি প্রায় ২৩ শতাংশ। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে উৎসারিত এই বর্জনজনিত ত্রুটি সিমিউলেশন অনুশীলনের অন্তর্নিহিত অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের পেনশন কর্মসূচির সুবিধা সাধারণভাবে অ-দরিদ্রদের জন্য প্রসারিত হতে পারে। একারণে, কল্পিত অনুশীলনে ব্যবহৃত ৫টি পুনর্গঠিত বা নতুন কর্মসূচি হলো: বয়স্ক ভাতা, শিশু সুবিধা, বিদ্যালয় বৃত্তি কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী সুবিধা এবং দুঃস্থ মহিলা সুবিধা কর্মসূচি। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এ অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির চেয়ে এখানে কম সংখ্যক কর্মসূচি ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে কর্মসৃজনমূলক ও খোলা বাজারে বিক্রয় কর্মসূচির সুবিধাসমূহ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

তৃতীয়ত, কল্পিত অনুশীলনে খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এ উল্লেখিত কর্মসূচিগুলির সুবিধার সাথে তুলনা করার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে প্রদেয় ভাতা সুবিধাকে ২০১০ সালের অর্থমূল্যে পরিবর্তন করা হয়েছে।

চিত্র ৫.২: প্রক্সি মিনস টেস্ট (পিএমটি)-এর অধীনে বর্জনজনিত ত্রুটি

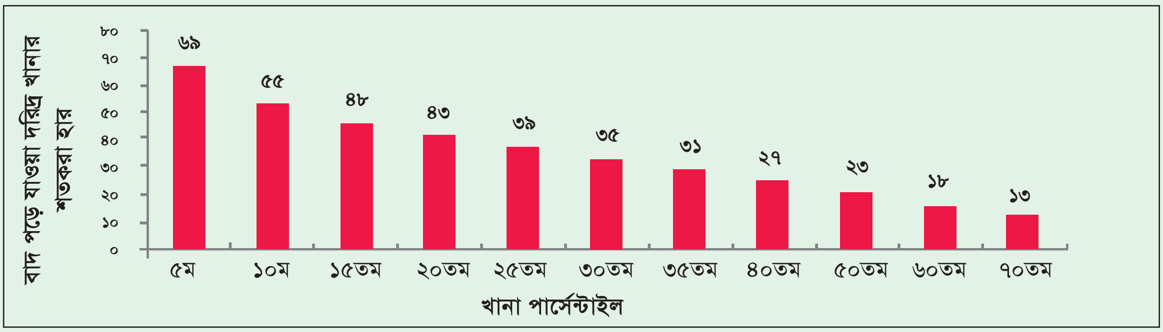

উৎস: এইচআইইএস ২০১০, বিবিএস-এর উপাত্ত ব্যবহার করে এনএসএসএস প্রাক্কলন।

উপরিউক্ত অনুমানসমূহ ব্যবহার করে কল্পিত অনুশীলনে প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ৫.৪ এ দেখানো হলো। প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চলমান কর্মসূচিসমূহের তুলনায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিগুলি দারিদ্র্যহ্রাসের পরিমাণকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে। এর কারণ হলো, একটি সুসংজ্ঞায়িত ও সমন্বিত এবং গড়ে উচ্চতর সুবিধাপ্রদানকারী সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে বেশি সংখ্যক দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয় বলেই দেখা যায়। প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশনামূলক হওয়ায় এর স্পষ্টীকরণে অতিরিক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তবে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে সামাজিক নিরাপত্তার প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি দরিদ্রদেরকে বেশি হারে সুবিধা প্রদান করতে সমর্থ হবে। অন্যান্য কর্মসূচির (বিশেষ করে কর্মসৃজন ও খোলা বাজারে বিক্রয়) প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হলে দারিদ্র্যহ্রাসের পরিমাণ আরও বেশি ও ব্যাপক হবে বলে ধারণা করা যায়। বর্জনজনিত ত্রুটি কমানোর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং এনজিও'র মাধ্যমে আরও সুচারুভাবে সুবিধাভোগী নির্ধারণ পদ্ধতি পরিচালিত হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যতে দারিদ্র্যহ্রাসের হার আরো বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৫.৪: পুনর্গঠিত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের দারিদ্র্য প্রভাব নির্ধারণে ব্যবহৃত কল্পিত অনুশীলনের ফলাফল

কল্পিত অনুশীলনের বিষয়	মাথাগুণতি দারিদ্র্য (%)	দারিদ্র্যগভীরতা (%)
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অনুপস্থিতি	৩৩.০	৭.৪
এইচআইইএস ২০১০ এ উল্লেখিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ ব্যবহার করে	৩১.৫	৬.৫
এনএসএসএস-এর প্রস্তাবিত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ ব্যবহার করে	২৮.৩	৪.৮

উৎস: আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বিবিএস-এর উপাত্ত ব্যবহার করে এনএসএসএস-এর কল্পিত অনুশীলন।

অধ্যায় ৬

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

অধ্যায় ৬
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

৬.১ পর্যালোচনা

যেকোনো সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা যথাযথ না হলে সুষ্ঠুভাবে প্রণীত এবং যথাযথ ও পর্যাপ্তভাবে অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সুশাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিজেই কিছু সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে কৌশল অধিকসংখ্যক কর্মসূচী পরিহার করবে এবং স্বয়ংক্রিয় অর্থ লেনদেন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা সহজ হবে সে কৌশল ও ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

উল্লিখিত পটভূমিতে, প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক দিক ও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এদুটি বিষয় সম্পর্কে ইতোমধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থার যেকোনো সংস্কার অবশ্যই বিদ্যমান পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে করতে হবে। এ অধ্যায়ে বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদারকরণে সংস্কার ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

৬.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও বিন্যাস সারণি ৬.১ এ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

- প্রথমত, ২৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪৫টি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে (সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত)।
- দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ মন্ত্রণালয়/সংস্থা ছোট আকারের কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যাদের সামষ্টিক বরাদ্দ মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ১ শতাংশেরও কম।
- তৃতীয়ত, প্রায় সাতটি মন্ত্রণালয় (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশেরও বেশি ব্যয় পরিচালনা করে থাকে।
- চতুর্থত, বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ একক কর্মসূচি হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি, যা একটি মন্ত্রণালয় (অর্থ মন্ত্রণালয়) এককভাবে পরিচালনা করে।

সারণি ৬.১: বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাজেট বরাদ্দ

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচির সংখ্যা (২০১৪ -১৫)	বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়)		মোট এসএসপিবাজেটের %	
		২০১৩-১৪	২০১৪ - ১৫	২০১৩ -১৪	২০১৪ -১৫
১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩১	২৫৬৬২	৩৭৪৮৩.৪	৯.৬২৮	১২.১৭৪
২. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রালয়	২৬	৩১১৪৯.৮	৩৭৫৪২.৪	১১.৬৮৭	১২.১৯৩
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১	৫৬৭২৯.৩	৬১০১০.৯	২১.২৮৪	১৯.৮১৫

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচির সংখ্যা (২০১৪ -১৫)	বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়নটাকায়)		মোট এসএসপিবাজেটের %	
		২০১৩ -১৪	২০১৪ -১৫	২০১৩ -১৪	২০১৪ -১৫
৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩	১১০০৩.১	১১৭৮৯.৩	৪.১২৮	৩.৮২৯
৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১	১৭৮০০.৭	১৯৫৫৬.২	৬.৬৭৮	৬.৩৫১
৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪	১৫১৬০	১৫৭৪৯.৪	৫.৬৮৮	৫.১১৫
৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬	৪২৮০	৪১৩০	১.৬০৬	১.৩৪১
৮. অর্থ মন্ত্রণালয়	৭	৭১৭৫০.৫	৮৭৩৭৭.৩	২৬.৯১৯	২৮.৩৭৮
৯. কৃষি মন্ত্রণালয়	৬	১৩৩৬	১৩৫৯.৬	০.৫০১	০.৪৪২
১০. মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়	৭	১৫১৪.১	১৯৬১.১	০.৫৬৮	০.৬৩৭
১১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪	২৫৯৪.৫	২৯৮৯.৭	০.৯৭৩	০.৯৭১
১২. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪	২৫১৭.৯	৩০২১.৩	০.৯৪৫	০.৯৮১
১৩. খাদ্য মন্ত্রণালয়	১	১৫৬৫০	১৬৮৭৫	৫.৮৭২	৫.৪৮১
১৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২৬৬৭	২৫০৮.৮	১.০০১	০.৮১৫
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	৫৯৭.৫	১০১৯	০.২২৪	০.৩৩১
১৬. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২৫	৩১	০.০০৯	০.০১০
১৭. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৮৬৩.৪	১২৪৪	০.৩২৪	০.৪০৪
১৮. ভূমি মন্ত্রণালয়	১	৩৫৮.৬	৯৮	০.১৩৫	০.০৩২
১৯. শিল্প মন্ত্রণালয়	১	১৫০০	০	০.৫৬৩	০.০০০
২০. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	১৩১৪.৫	৩২০	০.৪৯৩	০.১০৪
২১. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩	১৮৫৭.৩	১৬১৬.২	০.৬৯৭	০.৫২৫
২২. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	৪৮.৯	৬০	০.০১৮	০.০১৯
২৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১	১৬০	১৬০	০.০৬০	০.০৫২
মোট (২৩টি মন্ত্রণালয়)	**১৪৫**	**২৬৬৫৪০.১০**	**৩০৭৯০২.৬০**	**১০০**	**১০০**

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংকলিত।

মোট বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের বৃহৎ অংশ পেয়ে থাকে খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৬ শতাংশ),[২১] তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ (২০ শতাংশ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১০ শতাংশ), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (৯ শতাংশ), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (৬.৪ শতাংশ) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (৫ শতাংশ)। বাজেট বরাদ্দের বিবেচনায় ১১টি বৃহৎ কর্মসূচির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সারণি ৬.২ এ দেখানো হলো।

[২১] আগস্ট ২০১২ সালে দুটি মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত হয়ে যাবার আগে খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় একই মন্ত্রণালয়ভুক্ত ছিল।

সারণি ৬.২: বৃহৎ আকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহ

মন্ত্রণালয়	কর্মসূচি
অর্থ	সরকারি কর্মচারীদের পেনশন
সমাজকল্যাণ	বয়স্ক ভাতা
	বিধবা ভাতা
	প্রতিবন্ধী ভাতা
	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক	ভিজিডি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	প্রাথমিক উপবৃত্তি
শিক্ষা	মাধ্যমিক বৃত্তি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কর্মসৃজন
	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
খাদ্য	খোলা বাজারে বিক্রয়

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। কতিপয় কৌশলগত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায় জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে কর্মসূচিতে বার্ষিক অর্থায়ন করে থাকে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে তা কোনো স্বতন্ত্র কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মসম্পাদন বা কার্যকারিতার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে বলে প্রতীয়মান হয় না। কর্মসূচিসমূহের পরিকল্পনার ঘাটতি, বিক্ষিপ্ততা, একই ধরনের লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে একাধিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপস্থিতি দেখা যায়। মূলত দুর্যোগ, ঝুঁকি, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত প্রকৃত প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের পরিপূরক পদক্ষেপ হিসেবে স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসচিসমূহের প্রশাসন বা পরিচালনা পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কর্মসূচিগুলি বহুসংখ্যক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানে কোনো মন্ত্রণালয়েরই সুস্পষ্ট কর্মদক্ষতা নেই। বস্তুত, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ কাগজভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) ব্যবহার করে কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগীদের তথ্যসম্বলিত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার যেমন নেই তেমনি কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করবে এমন কোনো উন্নত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও নেই। ফলে সরকারের পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের কার্যকরভাবে পরিচালন ও পরিবীক্ষণ সম্ভবপর হয় না।

তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকার কারণে ভাতা বা অর্থ প্রদান ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয়। অনেক সহায়তার অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হলেও কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রথমে স্থানীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং স্থানীয় সরকার তা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। এতে জাতীয় পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান করে সেবাপ্রদানকারীর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করার যে অর্থনৈতিক সুবিধা তা লাভের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। দুর্বল পরিচালন ও পরিবীক্ষণের কারণে খাদ্য সহায়তামূলক কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য অপচয় হয়ে যাওয়ারও অনেক নজির রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের ৩০ শতাংশ অপচয় হয় বলে দাবী করা হয়। ভিজিডি কর্মসূচিতে খাদ্যশস্যের অপচয়ের (লিকেজের) পরিমাণ প্রায় ১৩ শতাংশ।[২২]

বিশেষ করে কেন্দ্র থেকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে কর্মসূচি পরিচালনার অন্যান্য দিক কার্যকর নয়। পর্যাপ্ত নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও এখানে নেই। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলি যে কার্যকরভাবে কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহি (যেমন, পরিবীক্ষণ পরিদর্শন বা তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের মাধ্যমে) করাতে সক্ষম সে ধরনের কোনো লক্ষণও পরিলক্ষিত হয় না। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্বীকার করে যে, কর্মসূচিসমূহ দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের কর্মচারীদের সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো দরকার।

[২২] Khatun et al: “100-Day Employment Generation Programme, challenges of effective implementation”; and Ahmed et al: “Relative efficacy of food and cash transfer in improving food security and livelihoods of the ultra-poor in Bangladesh”

৬.৩ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবা প্রদান শক্তিশালীকরণ

সঙ্গত কারণেই সরকার উপলব্ধি করে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সফলতার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সমস্যা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উত্তম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে তা দুর্নীতি কমাতেও সহায়তা করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় উপকারভোগীদেরকে সেবা প্রদানের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শক্তিশালী করা না হলে চতুর্থ অধ্যায়ে যেসকল প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি সফল হবে না। বস্তুত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল ক্ষেত্রগুলো হলো:

- একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার (এনএসএসএস) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে জোরদার ও নিশ্চিত করবে।

- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ দক্ষভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীদেরকে কার্যকারভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

- তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের (এমআইএসএস) মান উন্নয়ন করা যাতে করে এগুলি কার্যকর ও দক্ষভাবে নগদ অর্থ সহায়তা সেবা প্রদানের ভিত্তি হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণে সহায়ক হতে পারে।

- দুর্নীতি কমাতে অর্থ প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং বিশেষ করে দরিদ্র ও দারিদ্রঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারসমূহের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

- কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে দেশের সকল নাগরিকই সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্টদের দুর্ব্যবহার ও প্রতিশ্রুত সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে।

৬.৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবা প্রদানে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের বিক্ষিপ্ততা, একাধিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপস্থিতি, সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এরূপ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস/সংস্কার ক্রমান্বয়ে তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হবে।

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলির ভেতরের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য ক্লাস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এর ফলে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হবে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের অধিকতর সমন্বিত বাস্তবায়নের সাথে সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিকল্পনার উন্নয়ন ও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক পরিকল্পনার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে। কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক একীভূতকরণ ও সমন্বয় পর্যায়-১ (২০১৫-২০২৫)-এ নিম্নলিখিত বাস্তবায়ন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে:

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিকে ৫টি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারে বিন্যস্ত করা হবে এবং প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ের জন্য একটি মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় থাকবে। বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি ক্লাস্টারগুলি হলো:

১. **সামাজিক ভাতা :** মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

২. **খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা :** মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়: খাদ্য মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

৩. **সামাজিক বিমা:** মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়: অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি পেনশনের জন্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বেসরকারি পেনশনের জন্য; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইত্যাদি ।

৪. **শ্রম/ জীবিকায়ন:** মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, অর্থ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইত্যাদি ।

৫. **মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন:** মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ইত্যাদি ।

অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা/বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলির দায়িত্ব হবে তাদের নিজস্ব কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, সঠিক লক্ষ্য নিশ্চিতকরণ এবং অপচয়রোধে অসহনশীলতা প্রদর্শন । এছাড়াও তারা তাদের ক্লাস্টারভুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করবে, এমআইএস কার্যকর করবে ও তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলো পরিবীক্ষণ করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রিপোর্ট করবে ।

মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়গুলি হচ্ছে সেসব মন্ত্রণালয় ক্লাস্টারভুক্ত বিষয়ের সাথে যাদের ব্যাপক সংযোগ রয়েছে । অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা/বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তারা চলমান কর্মসূচিসমূহের সমন্বয় ও নতুন কর্মসূচির নকশা প্রস্তাব করবে, ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং এসএসপি বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি)-নিকট সেসব প্রতিবেদন পেশ করবে ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবে । সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হতে উপস্থাপিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রিক কাজের বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন করবে । এটি সিএমসি-কে কারিগরি, আর্থিক, প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে । সিএমসি কর্ম/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে, সামাজিক নিরাপত্তা সংস্কারের বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় নিশ্চিতকরণ, সমস্যা সমাধান ও সংকট প্রশমন করবে । সিএমসি-র আরও দায়িত্ব হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং নতুন কর্মসূচির নকশা অনুমোদন দেয়া । সিএমসি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলির কর্মসূচিসমূহের এমআইএস-এর কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে । এছাড়াও সিএমসি এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করবে ।

বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাঠ-পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সমন্বয় সাধনে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে ।

যেসব মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ ক্রস-কাটিং দায়িত্ব পালন করবে সেগুলো হলো:

- **সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ:** সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলির ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য জাতীয় কৌশলের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতির সামঞ্জস্যকরণ, এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রস্তুতকরণের দায়িত্ব পালন করবে অত্র বিভাগ । এছাড়া, অত্র বিভাগ বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং সিএমসি-কে অতিরিক্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে ।

- **বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ:** আইএমই বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে ।

- **পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ:** পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) এবং বিবিএস উপকারভোগীদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করবে ।

- **অর্থ বিভাগ:** এই মন্ত্রণালয় সরকার কর্তৃক অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন ও ব্যয় বরাদ্দ করবে এবং আর্থিক সেবাপ্রদান বিষয়ে তদারকি করবে ।

- **স্থানীয় সরকার বিভাগ:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকারভোগী চিহ্নিতকরণে কমিউনিটি ভিত্তিক অংশগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এছাড়া, অত্র বিভাগ এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির কর্মসূচিসমূহের সেবাপ্রদানে সহায়তা করবে।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে (ধাপ-১, ২০১৫-২০২৫) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) ব্যবস্থাপনা বিন্যাস চিত্র ৬.১ দেখানো হলো:

চিত্র ৬.১: ধাপ ১: ২০১৫-২০২৫

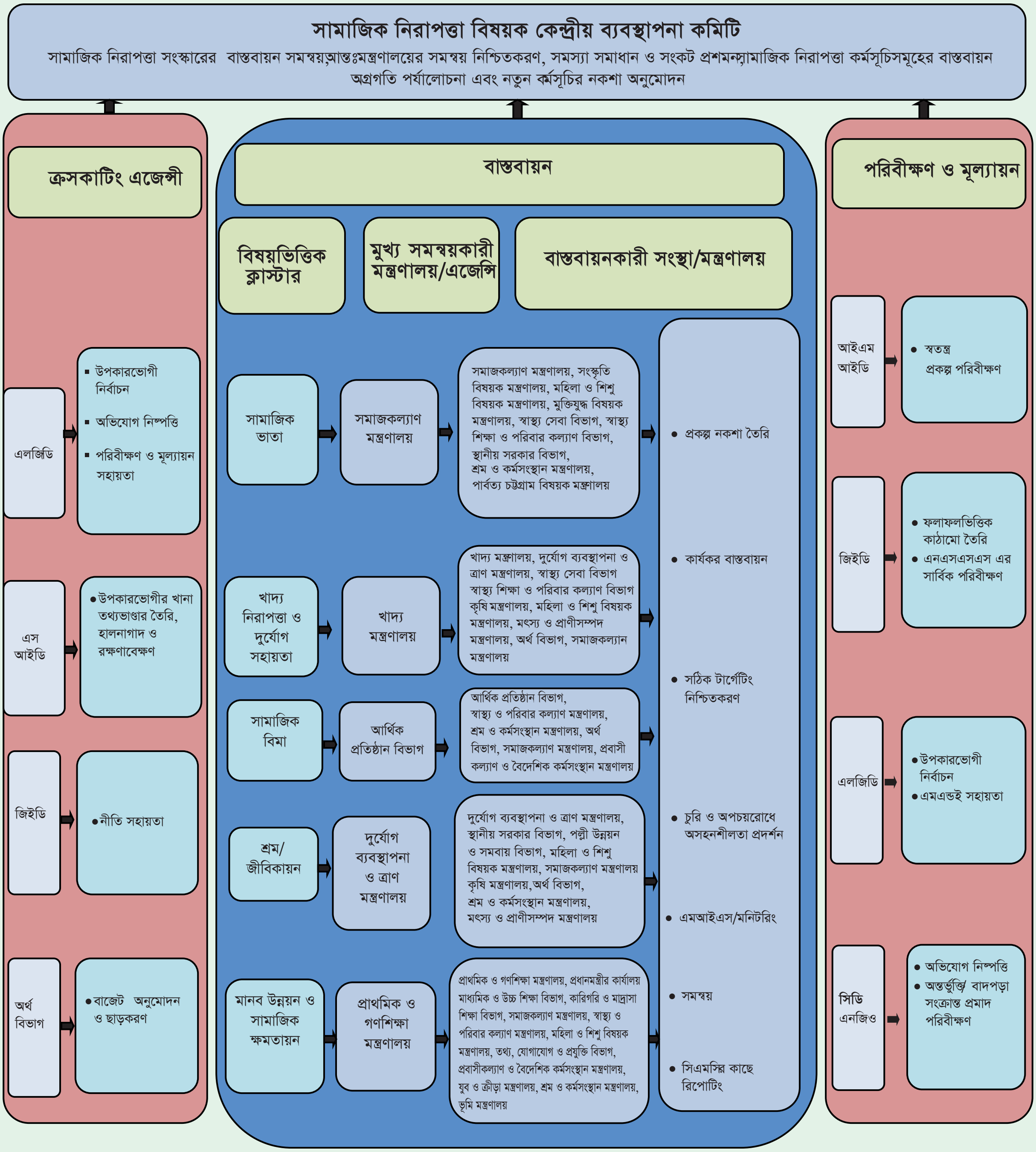

ধাপ-২ এর অংশ হিসেবে, জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হবে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে যা জীবনচক্রভিত্তিক সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে,

যেমন:

- শিশুদের ভাতা (এতিমদের জন্য কর্মসূচিসহ)
- ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা ভাতা কর্মসূচি
- প্রতিবন্ধী ভাতা
- বয়স্ক ভাতা
- মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচি

উল্লেখ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম, কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিসমূহ, খোলা বাজারে বিক্রয় ও জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচিকে পুনর্গঠিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির কার্যবণ্টনের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিপদ বিবেচনায় নিয়ে নতুন উদ্ভাবনীমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে তারা এসব কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করবে। মন্ত্রিপরিষদের সুশাসন ও নীতি প্রণয়নসংক্রান্ত কাজ অব্যাহত থাকবে এবং মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলির ক্রস-কাটিং ইস্যু এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। ধাপ-২ এর (২০২৬ পরবর্তী) ব্যবস্থাপনা বিন্যাস চিত্র ৬.২ এ উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র ৬.২: ধাপ-২: ২০২৬ পরবর্তী

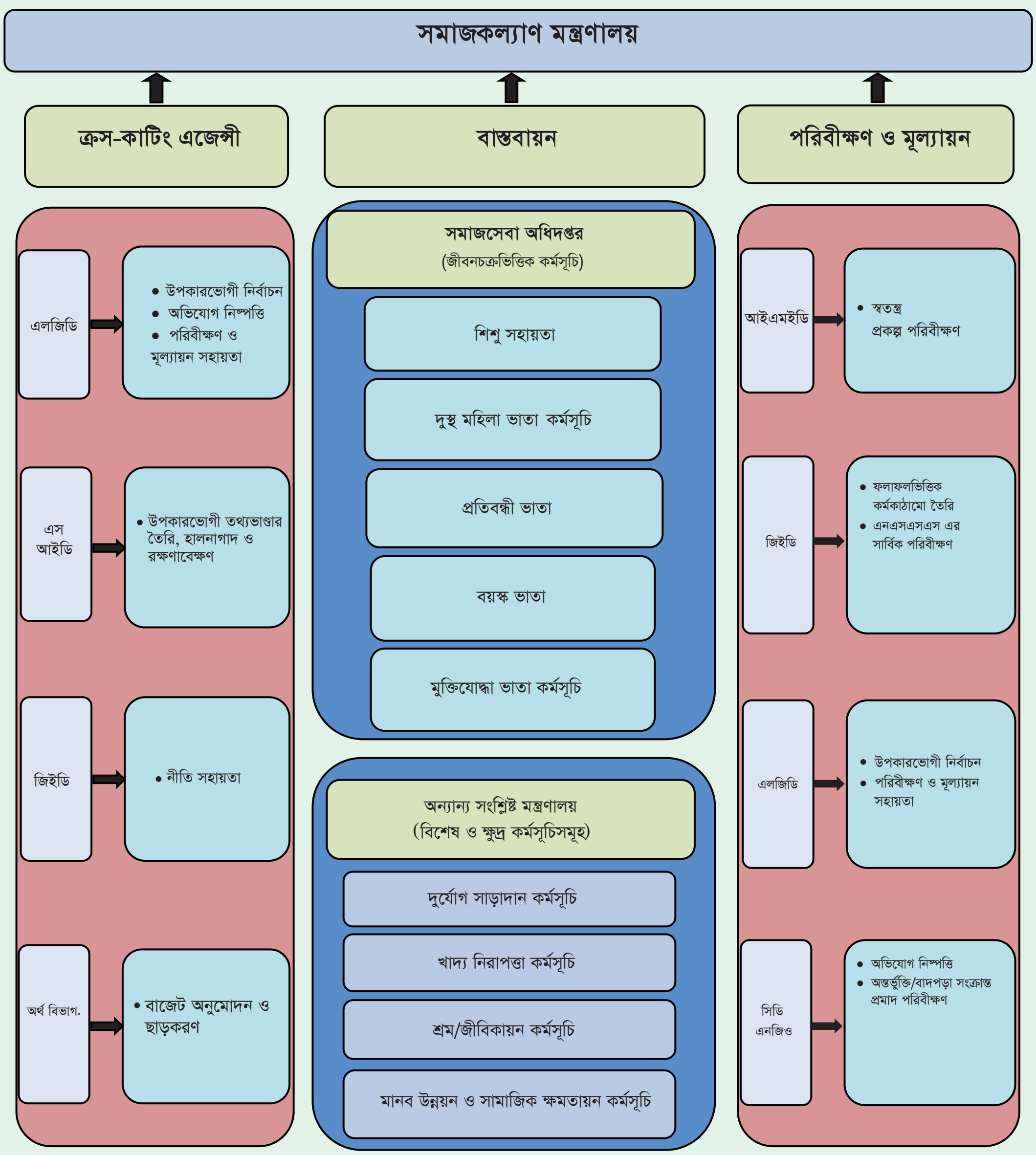

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর

পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলির সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে:

১. শিশুদের জন্য ভাতা (এতিমদের জন্য কর্মসূচি সহ)

২. ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা ভাতা কর্মসূচি

৩. প্রতিবন্ধী ভাতা

৪. বয়স্ক ভাতা

৫. মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচি

- জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের জন্য বিস্তারিত বাস্তবায়ন কৌশল তৈরি করবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- জীবনচক্রভিত্তিক মূল কর্মসূচিসমূহের আওতাবহির্ভূত কর্মসূচিগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এনএসএসএস-এর অর্থায়ন ও তৎসম্পর্কিত নীতি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে এবং সরকারি চাকুরির পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।
- পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বয় তদারকি করবে। এনএসএস-এর সাথে সামাজিক নিরাপত্তা নীতি/কৌশলের সামঞ্জস্য বিধান এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।
- নীতি, কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধিবিধান মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন ও কার্যকর করবে।
- বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলি সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য সেবাগ্রহীতাদের কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার দক্ষ ও কার্যকর সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এ উদ্দেশ্য অর্জনে এর প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ:

- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্গঠিত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যা দক্ষ ও কার্যকরভাবে সেবাগ্রহণকারীদের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানে সক্ষম হবে;
- জীবনচক্র সম্পর্কিত সব ধরনের কর্মসূচির সেবা সরবরাহে সেবা প্রদানের মানদণ্ড প্রস্তুত করা এবং সেবা প্রদানে এসব আদর্শমান অনুসরণ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সেবা প্রদানে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও বিশেষায়িত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা;
- প্রতিটি কর্মসূচির নির্দেশনাবলি অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করা;
- যোগ্য উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করা এবং অর্থ সেবাপ্রদানকারীদেরকে নিয়মিতভাবে সঠিক তালিকা সরবরাহ করা;
- উচ্চ মানসম্পন্ন তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে;
- অর্থ সেবাপ্রদানকারীদেরকে তদারকির জন্য কার্যবিধি ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেবাপ্রদানকারীরা যেন উচ্চমান বজায় রেখে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;
- সব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এবং মন্ত্রণালয়ভুক্ত সব ইউনিটের উচ্চমানসম্পন্ন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং
- উচ্চমানসম্পন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং জিম্মাদার সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি কমাতে কার্যবিধি প্রণয়ন করা ও সেগুলো অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৬.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চমানসম্পন্ন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) আবশ্যক। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিভিন্ন দেশের উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগের কারণে বিদ্যমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্বতির দুর্বলতা একদিকে যেমন বিনিয়োগকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয় তেমনি অন্যদিকে কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের সামর্থ্যকে খর্ব করে। অধিকন্তু, কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থ সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছানো ও তা সুবিধাভোগীদের উপরে ব্যাপক প্রভাব রাখছে কিনা তা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় নিয়ে আসাটা কোনো সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেক উন্নয়নশীল দেশের দৃষ্টান্ত থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়ার মতো দেশগুলোতে দেখা যায় যে বিভিন্ন কর্মসূচির এমআইএসসমূহ প্রয়োজনে একটির সাথে অপরটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং এভাবে সকল প্রধান কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সরকারকে জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব। কার্যত বাংলাদেশে খানা ভিত্তিক তথ্য ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ স্বাধীন অথচ পরষ্পর সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচিভিত্তিক এমআইএসগুলির নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে জাতীয়ভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সুতরাং, বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে ও সরকারকে সামগ্রিক তথ্য প্রদান করতে পারে এমন এমআইএস-এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রস্তুত করবে। এই একক তালিকা সকল বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) এই একক তালিকা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশের সব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এমআইএস-এর উপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করবে। এই সমীক্ষার কাজ হবে একটি উত্তম একক তথ্য তালিকা প্রতিষ্ঠায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে সে বিষয়েও সুপারিশ প্রদান করা। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে এমআইএস চালু করবে। পরবর্তীতে দেশব্যাপী এমআইএস সম্প্রসারণ করা হবে। আশা করা যায় ২০১৮ সাল নাগাদ একটি সম্পূর্ণ কার্যকর জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

এমআইএস এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে নিম্নরূপ:

- সব কর্মসূচিতে এমআইএস তথ্যভাণ্ডারের জন্য একই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা।
- উচ্চমানসম্পন্ন কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে বিনিয়োগ করা।
- তথ্য আদান-প্রদানে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা।
- অনুমোদিত প্রটোকল অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সরকারের সকল স্তরে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করা।
- এমআইএস ব্যবস্থাপনায় পেশাগতভাবে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা।
- নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিতকরণে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা।

৬.৫ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে সরাসরি সরকার থেকে ব্যক্তি (জি২পি) পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদারকরণ

জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হবে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের আরেকটি মূল সংস্কার যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার ঘটে এবং অপচয় রোধ করা যায়। আর্থিক ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যাতে করে উপকারভোগীরা বিভিন্ন আর্থিক সেবা যেমন, সঞ্চয় হিসাব খোলা, ঋণ সুবিধা ও বিমা সুবিধায় ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছে।

সুতরাং, এ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বিদ্যমান জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা সম্পাদন করবে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমূহও পর্যালোচনা করবে। পর্যালোচনার মাধ্যমে উপকারভোগীদের অর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান অর্থ প্রদান ব্যবস্থাকে কীভাবে সংস্কার করা হবে সে বিষয়ে তারা সুপারিশ প্রদান করবে। এ পর্যালোচনা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে শুরু হতে যাওয়া এমআইএস সমীক্ষার সমান্তরালে পরিচালিত হবে। আলোচ্য পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সরকার কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে। অতঃপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ মূল সেবাদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সহযোগিতায় ২০১৬ সালের জুলাই মাস নাগাদ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

৬.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি জোরদারকরণ

দেখা গেছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি হলো:

- দরিদ্র পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে গৃহীত কর্মসূচিগুলিতে অতিদরিদ্রদের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে অথচ যারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রায় ৩৩ শতাংশের বয়স নির্ধারিত বয়স সীমার চেয়ে কম।
- দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি জোরদারকরণ এবং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন।

মূল সামাজিক কর্মসূচিগুলিতে প্রস্তাবিত ব্যয় বাড়লেও ভাতা/সহায়তা সঠিক মানুষের কাছে যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তবে, বিশেষ করে দারিদ্র্যভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সঠিকভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একটি অভিন্ন সমস্যা। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রক্সি মিনস টেস্ট (পিএমটি) পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশ দারিদ্র্য তথ্যভাণ্ডার (বিপিডি) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিএমটি এপ্রোচের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের চিহ্নিত করতে স্থানীয় সরকার ও এনজিসমূহের সহায়তায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরতে খানাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারের নিয়মিত ও ধারাবাহিক হালনাগাদকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক উন্নয়নশীল দেশ বয়স নির্ধারণে কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, কাজেই বাংলাদেশ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ক্ষেত্রেই অনেক দেশের পক্ষেই প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা সমস্যাজনক। তবে, সরকার প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

সুতরাং, সরকার উপকারভোগী বাছাইয়ের বিদ্যমান প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করবে যা প্রতিটি কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাবে। এ সমীক্ষা কেবল বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিশুদের জন্য সুবিধা সংক্রান্ত কর্মসূচিকেই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবে না, বরং শিক্ষা উপবৃত্তি, দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি এবং ওয়ার্কফেয়ার কর্মসূচিকেও পর্যালোচনা করবে। এই পর্যালোচনা উচ্চমানের নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করবে। ডিসেম্বর ২০১৫ নাগাদ এ সমীক্ষার কাজ শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং জুন ২০১৬ নাগাদ আলোচ্য পর্যালোচনার সুপারিশ পেশ করা হবে। তারপর, জুলাই ২০১৬-এর পর থেকে সরকার পর্যায়ক্রমে কর্মসূচিগুলিতে নতুন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ সমীক্ষা পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবে। তবে সমীক্ষার কাজে সহায়তাকল্পে একটি 'ক্রস গভর্ণমেন্টাল এডভাইজরি বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

উপকার গ্রহীতাদের বিষয়ে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব সরকারের এ ধরনের উপলব্ধির কারণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে, যা দেশব্যাপী প্রয়োগযোগ্য একটি নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করবে। বাছাই প্রক্রিয়া বিষয়ে পরিচালিত সমীক্ষার সমান্তরালে এ সমীক্ষা পরিচালিত হবে এবং এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন জুলাই ২০১৬-এর পর থেকে শুরু হবে।

৬.৭ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা

সামাজিক নিরাপত্তার সাথে উন্নয়ন অংশীদারগণ নানাভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। গত দশকে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারগণ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে প্রধানত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মসূচিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ডিএফআইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং চর জীবিকায়ন কর্মসূচির (সিএলপি) অর্থায়নের উৎস ডিএফএটি-এর সহায়তায় একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (এফএলএসপি)' এবং 'ফুড এন্ড সিকিউরটি ফর দ্যা আলট্রাপুওর প্রোগ্রাম (এফএসইউপি)'। ইউএনডিপি অর্থায়িত প্রকল্পগুলি হলো 'রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপারচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস (আরইওপিএ) এবং 'স্ট্রেংদেনিং উইমেন'স এবিলিটি ফর প্রোডাকটিভ নিউ অপারচুনিটিস (এসডাব্লিইএপিএনও)'। এসব কর্মসূচি মূলত আয় বর্ধনমূলক বা সম্পদ হস্তান্তরমূলক কর্মসূচি যেগুলি বহু সংখ্যক অতিদরিদ্রকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে লক্ষণীয় মাত্রায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হলো বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হলো দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ জোরদারকরণ, পিএমটি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি জাতীয় একক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শর্তযুক্ত একটি নতুন নগদ অর্থ হস্তান্তরমূলক (সিসিটি) কর্মসূচি প্রবর্তন। বিশ্বব্যাংক দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এসআইডি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে তারা ঘনিষ্টভাবে কাজ করে থাকে।

গত তিন বছর ধরে উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োজন বিষয়ে সরকারের সাথে একটি নীতি-সংলাপ আয়োজনে সচেষ্ট রয়েছে। এর ফলে এনএসএসএস-এর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা ও কারিগরি সহায়তা শীর্ষক একটি কার্যকরি কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। এনএসএসএস প্রণয়নের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে ব্যাপকতর অংশীদারিত্ব বিষয়ে একটি কাঠামো গঠিত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদারদের সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহকে সরকার স্বাগত জানায় এবং স্বতন্ত্র্য কর্মসূচিতে তাদের সহায়তার জন্য সরকার এনএসএসএসকে কাজে লাগাবে। এনএসএসএস বাস্তবায়নে সরকার কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করবে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কাঠামোর (যা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

৬.৮ এনজিওদের সাথে সম্পৃক্ততা

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্বমানের বেশকিছু এনজিও গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের এনজিওদের উদ্ভাবিত 'গ্র্যাজুয়েশন' এপ্রোচ বর্তমানে অনেক দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সফলভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এনজিও ও কমিউনিটির মাঝে অংশীদারিত্ব বিষয়ে সরকার গর্ববোধ করে থাকে। দারিদ্র্য নিরসন ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্ব ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। সরকার এনএসএসএস- এর উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বকে অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনে এই অংশীদারিত্বকে আরো গভীরতর ও বিস্তৃত করবে। যেসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উপকারী হতে পারে সেগুলি হলো:

উদ্ভাবনীমূলক ধ্যানধারণা পাইলটিং করা, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় বসবাসের কারণে বা জনসংখ্যার প্রান্তিক বা অরক্ষিত সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন তাদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণ, এবং এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা।

অধ্যায় ৭

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

অধ্যায় ৭

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

৭.১ সার্বিক চিত্র

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হবার পর শুরু হবে এর বাস্তবায়ন পর্যায়। এ পর্যায়ের প্রধান করণীয়সমূহের মধ্যে থাকবে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, কর্মসূচির ফলাফল নথিবদ্ধকরণ এবং বিকল্প পন্থাসমূহের কার্যকারিতা বিষয়ে নীতিনির্ধারকগণকে অবহিতকরণ। এছাড়া কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের সম্প্রসারণ ও টেকসহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক সমর্থনের। এ প্রেক্ষিতে একটি চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

পরিবীক্ষণ হলো কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশকসমূহ চিহ্নিতকরণ ও অনুসরণের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মসূচির জীবনকালব্যাপী বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়। কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে অগ্রগতি ও সাফল্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য অংশীদারদেরকে অবহিত করার জন্য কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহের উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং সেগুলি পর্যালোচনা করার একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেও পরিবীক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। মূল্যায়ন হলো পরিবীক্ষণের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ যা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের (আউটকাম) সাথে সংশ্লিষ্ট কারণসমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং কৌশলের বিভিন্ন উপাদান বা কৌশলভুক্ত কোনো কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবার পর এদের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মূলে থাকবে কৌশলের নকশা, বাস্তবায়ন ও ফলাফলের নৈর্ব্যক্তিক ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংক্রিয় আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (এমআইএস)। একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসূচির ধরন অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তালিকা সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ এবং অনলাইনে অনুদানের অর্থ প্রদান করতে সক্ষম। এর ফলে একদিকে যেমন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সহজতর হয় তেমনি অন্যদিকে অর্থ লেনদেনের ব্যয় ও দুর্নীতিও কমে আসে।

৭.২ বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই। জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বরাদ্দকৃত সম্পদ কতটুকু সফলভাবে ব্যবহার করছে তা পদ্ধতিগত উপায়ে মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে স্বতন্ত্র বা মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রেও কোনো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। দাতাদের নির্দেশে কিছু কর্মসূচির উপর স্বাধীন প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা হয়েছে। এসব সমীক্ষায় মিশ্র ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। অতি সম্প্রতি কিছুসংখ্যক দাতা সংস্থা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি আনুষ্ঠানিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করছে।[২৩]

কর্মসূচিগুলি কতটুকু ভালোভাবে কাজ করছে তা বুঝতে এবং বাস্তবায়নের ব্যবধানসমূহ চিহ্নিত করতে (যা উত্তম নকশা, উত্তম তথ্য ও উত্তম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাধা করা প্রয়োজন হবে) সরকারকে সহায়তাকরণে জাতীয় পর্যায়ে ও কর্মসূচিভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরি। ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার কার্যক্রম থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন নিশ্চিত করতে এটি অপরিহার্য। এছাড়া মন্ত্রণালয়গুলি কর্মসূচির পারফরমেন্সভিত্তিক বাজেট প্রণয়নকালেও একে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে কার্যকর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ ব্যবস্থায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলও অন্তর্ভুক্ত

[২৩] বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট দরিদ্রদের জন্য এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম।

থাকবে। বর্তমানে প্রকল্প বা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপর ন্যস্ত। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সংস্থা হিসেবে সরকারি খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের তদারকি করে থাকে এ বিভাগ। অবশ্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অনুসরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তবে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি ও ব্যবধান রয়েছে"।

এ ব্যবধান দূর করার জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রচলিত ইনপুট-আউটপুট নির্ভর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। এ নতুন ব্যবস্থার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকগণ কৌশল ও কর্মসূচির অর্জন (আউটকাম) ও প্রভাব (ইমপ্যাক্ট) আরও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। খাতভিত্তিক কৌশলের ফলাফলনির্ভর পরিবীক্ষণ সম্পাদনের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল একটি প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করবে আর তা হবে এ অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশকসমূহের একটি উপসেট। এক্ষেত্রে ৭.৪ অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সহায়ক হবে।

৭.৩ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কৌশল

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করবে:

- কৌশলগত উদ্দেশ্য - জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কি দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস, মানব উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জন করছে?
- প্রায়োগিক উদ্দেশ্য - ব্যবস্থাপকগণ কীভাবে নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে পারে?
- শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য - সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে?

এনএসএসএস এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারগুলো নিম্নোক্ত তিনটি স্তরের জন্য প্রয়োজন হবে:

১.১। কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণ

১.২। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ

১.৩। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অধীনে সাধারণত এ তিনটি স্তরের প্রতিটির জন্য অনেকগুলি নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়, প্রতিটি স্তরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলাফল অর্জন চিহ্নিত করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। এজন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এবং সম্ভাব্য উপায় বা হাতিয়ারসমূহ নিম্নের ৩টি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত তিনটি স্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ।

৭.৩.১ কৌশলের অধীনে স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন; এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবাগ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান
- এককপ্রতি মূল্য হস্তান্তরের (ভ্যালু ট্রান্সফার) ব্যয় (যেমন, ১০০ টাকা)

বিভিন্ন সাধারণ শিরোনামের অধীনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কর্মসূচির তাৎক্ষণিক প্রভাব যেমন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করবে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর সুনির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে যেমন, শিক্ষাগত প্রভাব (শিক্ষামূলক কর্মসূচি) বা পুষ্টিগত প্রভাব (স্বাস্থ্য বা পুষ্টিগত কর্মসূচি) চিহ্নিত করবে। প্রতিটি শিরোনামের অধীনে আলোচ্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে এমন নির্দেশকের কিছু উদাহরণ নীচে প্রদান করা হলো।

অর্থনৈতিক প্রভাব

- খানা/পরিবারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন-গৃহস্থালি ও মজুরিভিত্তিক কাজ
- অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নয়ন
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি যেমন, ব্যাংক হিসাব খুলতে পারা

সামাজিক প্রভাব

- সুবিধাভোগীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও মতপ্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি
- সনাতনী সামাজিক জেন্ডার নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন
- শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ কমানো

শিক্ষাগত প্রভাব

- স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বৃদ্ধি
- শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি
- পরবর্তী ধাপে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হবার হার বৃদ্ধি

পুষ্টিগত প্রভাব

- স্তন্যপানের হার বৃদ্ধি (১-১২ মাস)
- খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি (৬-২৩ মাস)
- স্তন্যপান ও ভোজনের হারসহ উন্নত বা মানসম্মত খাদ্যের প্রাপ্যতা (৬-২৩ মাস)
- খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি (প্রজনন বয়সী মহিলাদের)

কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকাংশ আসবে কর্মসূচির নিজস্ব তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থেকে। সঠিকভাবে পরিচালিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পারস্পরিক সমন্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এর ফলে সহজেই তথ্য বিনিময়, সংকলন এবং তুলনা করা যায়। তবে একটিমাত্র সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থাকতে হবে এমন নয়। বিভিন্ন কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও প্রশাসনিক ব্যবধানের কারণে একক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর নাও হতে পারে। একইভাবে সমন্বিত সুবিধাভোগী তথ্যভাণ্ডারও অপরিহার্য নয়; প্রায়শই এটি বাস্তবসম্মত নয় এবং এক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সবগুলি কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। এর পরিবর্তে বরং সকল কর্মসূচির জন্য অভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করা যায়, যার ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্যের তুলনা ও সংকলন সহজ হবে। পাশাপাশি সব কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিটি তথ্যভা-ারের ক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগীর জন্য অভিন্ন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে।

কর্মসূচিভিত্তিক পরিবীক্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে এসব কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আকস্মিক ত্বরিত নিরীক্ষণ (স্পট চেক) ব্যবস্থা।

৭.৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটির পরিবীক্ষণ প্রয়োজন হবে তা হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সার্বিক বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতে হবে:

- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীদের নিকট পৌঁছে?
- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীদেরকে বাদ দেয়?
- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম?
- অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর এর প্রভাব কী?
- কৌশলের উপাদানগুলোর নকশা প্রণয়নের আরো ভালো কোনো উপায় আছে কি?
- কৌশলটিকে আরও অধিক দক্ষভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে কি?
- বরাদ্দকৃত সম্পদ/অর্থ কি দক্ষতার সাথে ব্যয়িত হয়?
- আর্থিক বিষয়ে কর্মসম্পাদন কি কৌশলের নকশা অনুযায়ী হয়?

এজন্য সেইসব নির্দেশকের প্রয়োজন হবে যা কৌশলটির আর্থিক, প্রায়োগিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

আর্থিক দিকসমূহ

- জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়
- মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়
- মোট কর্মসূচি ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে প্রশাসনিক ব্যয়

প্রায়োগিক দিক

- সুবিধাভোগীর সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে সুবিধাভোগীর সংখ্যা

প্রাতিষ্ঠানিক দিক

- আলোচ্য কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা
- প্রশিক্ষণগ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা (কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে)
- নির্বাচন, বিতরণ, অর্পণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন
- কর্মসূচির নকশায় সুবিধাভোগীদের ব্যাপকতর সম্পৃক্ততা
- চাহিদাগত সাড়াদান বৃদ্ধি
- সরবরাহগত সাড়াদান বৃদ্ধি
- সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলকে টেকসই ও চলমান রাখতে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি

৭.৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন

ফলাফলভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্ভবত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন। এছাড়াও রয়েছে প্রায়োগিক দিকসমূহের মূল্যায়ন যেমন, উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দক্ষতা ও কার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও পুষ্টিগত ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ কৌশলের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। বিভিন্ন শিরোনামের আওতায় সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো।

দক্ষতা

- শতকরা হিসেবে দারিদ্র্যহারের হ্রাস
- শতকরা হিসেবে দারিদ্র্যব্যবধান হ্রাস
- জিনি বা দারিদ্র্য পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অসমতা হ্রাস
- দারিদ্র্যব্যবধান হ্রাসে একক প্রতি ব্যয়
- সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা হতে বঞ্চিত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং মাথাপিছু দারিদ্র হ্রাসের একক ব্যয় কমানো

অর্থনৈতিক প্রভাব

- পরিবারপ্রতি ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি
- সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং ঋণের পরিমাণ হ্রাস
- পরিবার কর্তৃক উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি
- খানার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

সামাজিক প্রভাব

- সামাজিক জেন্ডার সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তন
- জীবনযাত্রার পছন্দ ও সুযোগের উন্নতি
- মেয়েদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
- শিক্ষিত মেয়েদের অর্থনৈতিক অবদান বৃদ্ধি

শিক্ষাগত প্রভাব

- স্কুলে ভর্তি, ধরে রাখা (রিটেনশন), উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপ্তকরণে জেন্ডার, সামাজিক ও আঞ্চলিক ব্যবধান হ্রাস
- শিক্ষণ ফলাফল (লার্নিং আউটকাম) ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদনের উন্নতি
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় গমনের উচ্চতর হার
- বিদ্যালয়ে অবস্থানের বছরের সংখ্যা বৃদ্ধি
- একই শ্রেণিতে একাধিক বছর পাঠ গ্রহণের হার হ্রাস

পুষ্টিগত প্রভাব

- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নির্দেশকের উন্নয়ন (টিকা, রুগ্নতা, খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য, ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদি)
- বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার শিশুর বা খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস
- মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুর হার হ্রাস

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রধান হাতিয়ার হবে নিয়মিত ও গুণগত ও পরিমাণগত জরিপ। অবশ্য বিদ্যমান বিভিন্ন জরিপ যেমন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের উপর কিছুটা হলেও নির্ভর করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৭.৪ দ্রষ্টব্য)। তবে খানা আয়-ব্যয় জরিপের পাশাপাশি একটি বার্ষিক প্যানেল জরিপ পরিচালনা করারও প্রয়োজন রয়েছে। এ প্যানেল জরিপ বিপদাপন্নতা ও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা আরো গভীরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে এবং সরকারকে বার্ষিক ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রভাব মূল্যায়নেও এটি সহায়তা করবে।

এছাড়া স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সার্বিক প্রভাব নির্ণয়ে আরও অনেক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত হবে। বহুসংখ্যক বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন পড়বে। আসলে প্রভাব মূল্যায়নের কোনো একক সর্বোত্তম পদ্ধতি নেই। বিকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে:

পরিমাণগত পদ্ধতিসমূহ

- পরীক্ষামূলক নকশায় (এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন) ব্যক্তি বা খানাকে সুবিধাভোগী (পরীক্ষাধীন গ্রুপ) এবং সুবিধাভোগী নয় (নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ) এমন দুটি দলে ভাগ করে থাকে। এ ধরনের পদ্ধতি (যা অনেক সময় র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল হিসেবে অভিহিত হয়) বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সুস্বীকৃত। তবে এগুলি পরিচালনা করা জটিল ও ব্যয়বহুল। তাছাড়া নৈতিকতার বিচারেও এ পদ্ধতি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে কেননা সর্বজনীন ভিত্তিতে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের অন্তর্ভুক্তদের বঞ্চিত করা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

- আংশিক পরীক্ষামূলক নকশা পদ্ধতিতে (কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন) কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন একটি নিয়ন্ত্রিত গ্রুপকে ব্যবহার করা হয়। এরপর "প্রবণতা অঙ্ক সাদৃশ্যায়ন (প্রপেনসিটি স্কোর ম্যাচিং)" অথবা "বহুচলকীয় প্রত্যাবৃত্তি পদ্ধতির (মাল্টিভ্যারিয়েট রিগ্রেশন অ্যাপ্রোচ)" মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এ পদ্ধতি প্রায়শই বৃহৎ আকারের নমুনা জরিপ ও অত্যাধুনিক পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বলে এটি ব্যয়বহুলও হতে পারে।

- কোনো একটি নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের সাথে প্রকল্প/কর্মসূচি সুবিধাভোগীদের বাস্তবায়নোত্তর (এক্সপোস্ট) তুলনা করা আরেকটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কাউন্টারফ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন পরিমাপের একটি উপায় হিসেবে বহুচলকীয় বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তা পরীক্ষামূলক ও কোয়াসি বা আংশিক পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অর্ধেকের চেয়ে কম হতে পারে। তবে এটি বৈজ্ঞানিকভাবে খুব একটি নির্ভুল নয়।

মিশ্র পদ্ধতি

- বাস্তবায়নোত্তর দ্রুত মূল্যায়ন/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রভাব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রপ আলোচনা, কেইস স্টাডি, মিনি সার্ভে, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক উপাত্ত। এ পদ্ধতিতে দ্রুত গতিতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। যেহেতু দ্রুত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যয় কমানো, সেহেতু এ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরিচালনার ব্যয় সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কম হয়ে থাকে।

গুণগত পদ্ধতি

- অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে যে এলাকাতে একটি কর্মসূচি পরিচালিত হয় মাঠ পর্যায়ের গবেষকরা সেখানকার মানুষজনদের সান্নিধ্যে একটি বড় সময় ব্যয় করে থাকে এবং তারা গুণগত তথ্য তুলে নিয়ে আসে ও ক্ষুদ্র পরিসরের জরিপও চালায়। পরিমাণগত পদ্ধতির বিপরীতে গুণগত পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় অংশগ্রহণকারী বিশ্লেষণ, অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন ও উপকারভোগী মূল্যায়ন।
- কেস স্টাডি ও লাইফ হিস্ট্রি হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট কৌশলের মাধ্যমে কোনো ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রশ্ন করে ও ব্যক্তিগত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ ও কর্মের ক্ষেত্রে একজন সমীক্ষক একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সহায়তা করে।

দেখা গেছে, তথ্য সংগ্রহের পরিমাণবাচক ও গুণবাচক পদ্ধতির মিশ্রণ প্রভাব মূল্যায়নে, বিশেষ করে জটিল সামাজিক পরিবেশে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের চারটি প্রধান কারণ হলো:

- মূল্যায়নকারীকে বিবিধ পদ্ধতি ও পন্থা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে ;
- ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে অনেকগুলো স্বাধীন ফলাফল প্রদান করে। এভাবে উপসংহার বা সিদ্ধান্তের যথার্থতা বৃদ্ধি পায়;
- কর্মসূচির প্রেক্ষাপটকে গভীরভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করে; এবং
- উপাত্ত সংগ্রহে সময় ও খরচ বাঁচায়।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের আওতায় পরিমাণবাচক বিশ্লেষণের উৎকর্ষ বাড়াতে এর পাশাপাশি প্রভাব মূল্যায়নকালে গুণগত বিশ্লেষণের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে এবং পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব নয় এমন সকল বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে যেমন: সামাজিক পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জেন্ডার নর্মস, কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্মসূচির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের ভিতরে আন্তঃক্রিয়ার প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণ ও অর্জনের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের প্রভাব/তাৎপর্য, জনগণের মতামত, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। মূল্যায়নের মিশ্র পদ্ধতি প্রাপ্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ট্রায়াঙ্গুলেশন প্রদান করে, প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ড পরিবর্তনে সাহায্য করে, পর্যবেক্ষিত ফলাফলের ভিন্নমাত্রিকতার ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিশদ ও ব্যাপক বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এ সবগুলি মূল্যায়ন পদ্ধতিই নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার গ্রহণযোগ্যতায় সহায়তাকরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৭.৪ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিতে পারে। প্রতিটি দেশেরই ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকে। বিশ্বে এমন কোনো মডেল নেই যা বাংলাদেশের জন্য সরাসরি প্রয়োগযোগ্য বা প্রযোজ্য হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

একটি কার্যকর তথ্য-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে সুষ্ঠু ভিত্তি প্রদান করে। এটি উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জেলা পর্যায় থেকে তথ্য আহরণ করে ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সেই তথ্য প্রেরণ কর সম্ভব। এক্ষেত্রে সব মন্ত্রণালয় অভিন্ন সফটওয়্যার প্রবর্তন করতে পারে যদিও নীতিগতভাবে এটি সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রতিটি উপাদানের (যেমন: বিভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি, প্রণোদনার ব্যবহার ও পরিবেশের- পরিস্থিতি ইত্যাদি) বিষয় মাথায় রেখে নির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে অভিযোজিত হবে। এভাবে এটি স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের কর্মসম্পাদন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে। এছাড়া ক্রস-কাটিং বিষয়সমূহ যেমন, লক্ষ্য নির্ধারণ, নিবন্ধন, অর্থ হস্তান্তর, মামলাসমূহের ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একটি তথ্য-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিভিন্ন কর্মসূচিসসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে।

সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়ের এমআইএস তথ্যভাণ্ডার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে যুক্ত হবে যা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রতিটি কর্মসূচির কার্যসম্পাদন তদারকি করার পাশাপাশি অর্থের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খানা তথ্যভাণ্ডারের সাথে এই তথ্যভাণ্ডারকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এটিকে জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডারের সাথেও সংযুক্ত করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এমআইএসের সাথে অন্যান্য জাতীয় তথ্যভাণ্ডার যেমন, আয়কর পদ্ধতির সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। একই জাতীয় শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডার একত্রীত করে সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ইন্দোনেশিয়ার মতো সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার বিপদ হলো এই যে সুবিধাভোগীদের যারা যে কোনো কারণেই হোক না কেন এমন একটি একক কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত হবে না তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো একটি কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন এবং সেটি বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা। এটি এমন একটি ব্যবস্থা হবে যা কর্মসূচির উপকারভোগী এবং কর্মসূচির উপকারভোগী নয় এমন সবাইকে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ করে দিতে পারে এবং এর পাশাপাশি যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সমাধান পেতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে যা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিভিন্ন পন্থার প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করে। যেমন কেনিয়ায় দ্যা হাঙ্গার সেফটি নেট প্রোগ্রাম (এইচএসএনপি) স্থানীয় "রাইটস কমিটিস" পরিচালনা করে, যা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানে সিটিজেনস সার্ভিস চার্টার এ উল্লেখিত নিয়ম/আদর্শ অনুসরণ করা হয় কিনা তা পরিবীক্ষণ করে। রুয়ান্ডার Vision 2020 Umurenge Programme (VUP) একটি অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি কেনিয়ার এইচএসএনপি-এর ন্যায় সুবিধাভোগীদের অধিকার নির্দিষ্ট করে। মোজাম্বিক বর্তমানে দেশটির সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি শক্তিশালী করছে যার অন্তর্ভুক্ত হলো কমিউনিটি কর্তৃক মামলা ব্যবস্থাপনা ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ভারতে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা পরিকল্প (MGNREGA) সামাজিক অডিট ব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল, যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সুগম করতে সাহায্য করেছে, জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে, কর্মসূচির সেবাপ্রদানে জবাবদিহিতার উন্নতি করেছে, এবং রাষ্ট্র ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ জোরদার করেছে। এদিকে বাংলাদেশ নিজের মতো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধানের পথ বের করেছে। যেমন ব্র্যাকের সিএফপিআর-টিইউপি এর অধীনে পরিচালিত গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন কমিটি এবং সিএলপি-এর অধীনে পরিচালিত হটলাইন অভিযোগ পদ্ধতি দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড হ্রাসে কার্যকর হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসসূচিসমূহের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পরিমাপের জন্য প্রমিত খানা জরিপ তথ্যেও যেমন খানা আয়-ব্যয় জরিপের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের দায়িত্ব স্বাধীন থিংক ট্যাংককে দেওয়া হয়েছে। যাহোক, একটি পন্থা হবে খানা আয়-ব্যয় জরিপ যুক্ত করে বার্ষিক প্যানেল সার্ভে পরিচালনার ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালিত হয়ে থাকে। পরবর্তী খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৫ সালে পরিচালিত হওয়ার কথা। এরপর থেকে এটি ৩ বছর অন্তর অন্তর পরিচালিত হবে। এটি ১২,০০০ এর ওপরে খানা নমুনায় অর্ন্তভুক্ত করে এবং এর ফলাফল পরে বিভাগীয় পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়। এমতাবস্থায়, অন্তর্বর্তীকালীন বছরগুলোতে প্যানেল জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে একটি ছোট আকারের নমুনা যেমন, এটিতে ৪,০০০ মতো খানা বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এসব খানা ২০১৫ ও ২০১৮ সালে পরিচালিত ব্যাপকতর খানা আয়-ব্যয় জরিপের সময় আবার নমুনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ কথা বলা যায় যে দারিদ্র্য, বিপদাপন্নতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিশ্লেষণে উচ্চ মানসম্পন্ন তথ্যের একটি সমৃদ্ধ উৎস হতে পারে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত প্যানেল সার্ভে। খানাগুলির মধ্যেকার আয় ও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা ভালভাবে বুঝতে এটি সরকার ছাড়াও অন্যান্য গবেষকদেরকে সক্ষম করবে। বর্তমানে পরিচালিত জরিপগুলি বহুমাত্রিক না হওয়াতে তা দারিদ্র্যের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা নীতির উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা অনুধাবন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া প্যানেল সার্ভে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা পরিবীক্ষণে সরকারকে সক্ষম করবে কারণ এ ধরণের জরিপের মাধ্যমে যারা সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাচ্ছে তাদেরকে যেমন চিহ্নিত করা যাবে তেমনি তারা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে তাও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। একথা অনস্বীকার্য যে একটি প্যানেল সমীক্ষা সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতা ও লক্ষ্য নির্ধারণ পরিবীক্ষণ করতে সক্ষম করবে এবং কর্মসূচিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে স্পষ্ট ধারণা ধারণা দিতে পারবে। সুতরাং প্যানেল সমীক্ষা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের সফলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসসূচিসমূহের প্রভাব সূচকের বিষয়ে আন্তজার্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে তিন ধরনের কর্মসূচির (শর্তহীন নগদ সহায়তা, শর্তযুক্ত নগদ সহায়তা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা পরিকল্প) উপর পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন মূল্যায়নে সাধারণত দশটি প্রভাব সূচক (দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যয়, সম্পদ, আয়, অসমতা, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য ব্যয়) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে।

এসব তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন পরিমাণবাচক জরিপের মাধ্যমে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে পরিমাণবাচক ধারণা/জ্ঞানের পাশাপাশি গুণবাচক কলাকৌশলসহ মিশ্র একটি পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এর কারণ নানাবিধ:

- পরিমাণগত পদ্ধতি পর্যবেক্ষিত বিভিন্ন পরিবর্তন পরিমাপ করতে পারলেও তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক বা নির্দেশককে (যেমন নারীর ক্ষমতায়ন, আন্তঃখানা গতিশীলতা, সুবিধাভোগীদের আত্মমর্যাদা অথবা সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি) সম্পূর্ণরূপে চিত্রায়িত বা ধারণ করা যায় না।
- স্বতন্ত্র খানাসমূহের উত্তরণ অত্যধিক জটিল ও তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নমুনা জরিপের মাধ্যমে এসব জটিলতাকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায় না।

এ কারণে এটি স্বীকৃত যে মিশ্র পদ্ধতি (তথাকথিত কিউ স্কয়ার্ড) ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতিকে বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে পরিচালিত করা যায় যেমন: (১) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতিকে সমন্বিত করা করা; (২) একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা উপাত্ত বিশ্লেষণের সময় অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যও যাচাই করা বা ট্রায়াঙ্গুলেটিং করা; এবং (৩) পরিমাণগত ও গুণগত এই উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে একটি সংশ্লেষিত নীতি সুপারিশে একীভূত করা। যথাযথ গুণবাচক কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হলো বিশেষায়িত সাক্ষাৎকার (খানা কেইস স্টাডি, কি-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ); ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও কর্মসূচির সুবিধাভোগী নয় এই দু'দলের উপস্থিতিতে পরিচালিত); অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (কমিউনিটিতে সম্পদের র‍্যাংকিং, কারণগত সম্পদের চিত্রায়ণ, সময়ানুবর্তীতা); গুণবাচক তুলনামূলক বিশ্লেষণ; ও সামাজিক বলয় বিশ্লেষণ।

৭.৫ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার নিম্নোক্ত তিনটি স্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে:

১. স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ
২. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ
৩. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব-মূল্যায়ন

৭.৫.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বিভাজন

স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। পরিবীক্ষণ কাঠামো নির্ভর করবে কর্মসূচির ধরনের উপর এবং এটি কর্মসূচির সাথে প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ নির্দেশক বা সূচক ব্যবহার করবে যা ইতোমধ্যে অনুচ্ছেদ ৭.৩ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসন নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রদান করে এমআইএস প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে।

প্রতিটি লাইন মন্ত্রণালয়ের এমআইএস তথ্যভাণ্ডারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের সাথে যুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এর আওতাভুক্ত সকল কর্মসূচির সুশাসন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে এ তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করবে।

পরিচালনা কমিটির এমআইএস তথ্যভাণ্ডারে অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতাভুক্ত সকল কর্মসূচির আর্থিক কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত একটি পৃথক তথ্যভাণ্ডারও রক্ষণাবেক্ষণ করবে অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমআইডি) স্বাধীনভাবে কর্মসূচির কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণের (ভৌত ও আর্থিক) জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির কাছে তারা অগ্রগতি-প্রতিবেদন দাখিল করবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মূল্যায়নকে বাস্তবায়নকারী লাইন মন্ত্রণালয়সমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখাই উত্তম। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশনকে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়েছে, "শক্তিশালী ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দরকার হবে লাইন মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সাথে নিবিড় যোগাযোগ। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে"।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যাবলিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হবে:

- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো তাদের স্ব-স্ব কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমআইডি)-এর দায়িত্ব হবে প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর দায়িত্ব হবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকসমূহ নির্বাচন করে ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে একটি ফলাফ-লভিত্তিক কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা, একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে এনএসএসএস-কে মূল্যায়ন করা এবং মন্ত্রিপরিষদের জন্য এনএসএসএস-এর ফলাফল বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা। উল্লেখ্য, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্কের সার্বিক সমন্বয়সাধন এবং মূল্যায়ন বিষয়ক ফলাফল প্রেরণের সামগ্রিক দায়িত্বও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তদারকি দায়িত্ব পালন করবে। বস্তুতপক্ষে, সিএমসি'র দায়িত্ব হবে আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "নীতি প্রণয়ন ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা এবং সময়ানুবর্তিতা গুরুত্বপূর্ণ, যা বস্তুতপক্ষে পরিসংখ্যানিক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলে"। ৭.৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সুপারিশসমূহের সাথে পরিসংখ্যানিক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তাই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ পরিচালিত নিয়মিত খানা জরিপসমূহের (যেমন, খানা আয়-ব্যয় জরিপ) উপর বহুলাংশে নির্ভর করবে এবং বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত প্যানেল সার্ভে ও গুণগত পন্থা দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। বস্তুত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মানসম্মত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত খানা জরিপ, বিশেষ জরিপ, শুমারি ইত্যাদি পরিচালনা করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সক্ষমতা বাড়ানো হবে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, শ্রমশক্তি জরিপ, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জরিপ, কৃষি শুমারি ইত্যাদির প্রকাশনা পরিকল্পনা কমিশনের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন চক্রের সাথে সমন্বয় করতে হবে"। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সঠিক ও যথাযথ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে সহায়ক তথ্যভাণ্ডার তৈরির নিমিত্ত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ/বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সামর্থ্য জোরদার করার ব্যাপারে এ কৌশল প্রস্তাব করে।

সম্মত নির্দেশকসমূহের উপর ভিত্তি করে বাছাইকৃত উপকারভোগী ও সুবিধাভোগী সম্পর্কে তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে প্রদান করার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ। এছাড়া তারা নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও এনজিওদেরকে সহায়তা প্রদান করবে।

৭.৫.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফলের যথাযথ ব্যবহার

সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয়িত অর্থ থেকে যে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া সম্ভব তা বোঝাতেই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলাফল প্রেরণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সব তথ্যই অংশীদারদের অর্থাৎ এক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নের এবং/অথবা অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সুবিধাভোগী, মন্ত্রণালয় ও এনজিওসমূহের কাছে সহজলভ্য হতে হবে। কর্মসূচির অর্জন (আউটকাম) এবং প্রতিটি কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত ভাতা পাওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে সুবিধাভোগীদেরকে অবশ্যই অবগত হতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ও মূল্যায়ন ফলাফল প্রকাশ করার মাধ্যমে তা সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা যেতে পারে।

সব মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে উপস্থাপনা করতে হবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব হবে মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের ফলাফলের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করা।

৭.৫.৩ সম্মুখে এগিয়ে যাবার উপায়

এটি অনস্বীকার্য যে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যে সক্ষমতা বা সামর্থ্য রয়েছে তার সাথে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে অভিযোজিত হতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। অভিজ্ঞতা যত বেশি বাড়বে এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বা সামর্থ্যের উন্নতি যত বেশি হবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা তত বেশি বিকশিত ও পরিপক্ক হবে। এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সহযোগী দলিল হিসেবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকাঠামোর পাশাপাশি একটি কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করতে হবে।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সামগ্রিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্পসমূহের কর্মসম্পাদনভিত্তিক পরিবীক্ষণের জন্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি তৈরি করবে এবং সুপারিশকৃত নির্দেশক বা সূচকসমূহ যেকোনো নতুন কর্মসূচির নকশা তৈরি এবং কর্মসম্পাদনভিত্তিক বাজেটিংয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে।

কর্মসূচির কর্মসম্পাদন বিষয়ক পর্যালোচনার উপরে ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে জেন্ডার নীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাস নীতিসহ বিভিন্ন সহায়ক নীতি তৈরি করতে হবে।

আশা করা যায়, যেসব উন্নয়ন অংশীদার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অদ্যাবধি সহায়তা করেছে তারা ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রক্রিয়ায়ও সহায়তা করে যাবে।

সংযুক্তি ১

পটভূমি পত্রসমূহের তালিকা

1. Framework Paper for Developing National Social Protection Strategy for Bangladesh
2. Poverty, Vulnerability and Inequality in Bangladesh
3. Building a Social Security System to Address Urban Poverty in Bangladesh
4. Social Security Strategies to Address Social and Gender-based Exclusion, including Disability, High-risk Groups and Minority groups
5. Social Security Financing and Affordability
6. Social Security Strategies to Address Idiosyncratic and Covariate Risks and Shocks, including Seasonal Poverty, Economic Recession and Natural Disasters
7. Taking Stock and Moving Forward: Enhancing Labour Strategies for Bangladesh's Vulnerable Groups
8. State of Governance within Social Security Sector in Bangladesh
9. Building a Social Security System to Address the Demographic Challenges Faced by Bangladesh
10. International Best Practice in Social Security: Implications for Bangladesh
11. A Review of Bangladesh Social Security System

GLOSSARY AND DEFINITIONS OF KEY TERMS

Bolsa Familia Scheme	A social welfare programme of the Brazilian government, part of the Fome Zero network of federal assistance programmes. Bolsa Família provides financial aid to poor Brazilian families; if they have children, families must ensure that the children attend school and are vaccinated.
Cash Transfer	Regular, predictable cash payments made to individuals or households, which reduce poverty through direct income support. Cash transfers seek to alleviate poverty in the short-term, while contributing to long-term poverty reduction by allowing households to invest in poverty-reducing activities and more effectively respond to shocks and risks.
Cash for Work (CFW)	Pay cash to individuals for undertaking community or public relief and reconstruction work. CFW projects are short term, labour intensive, interventions designed to repair or rebuild a collective asset (e.g. building drainage systems, clearing agricultural land, planting trees, rural access roads, debris clearance, replant crops) while simultaneously injecting cash into local markets.
Child Protection	The prevention and response to violence, exploitation and abuse against children including, for example, commercial sexual exploitation, trafficking, child labour and harmful traditional practices, such as female genital mutilation/cutting and child marriage.
Conditional Cash Transfer (CCT)	Regular, predictable cash payments made to individuals and households that are conditional upon the fulfilment of behaviour, as defined by programme. CCTs impose penalties on beneficiaries who fail to comply with conditions. The type and extent of penalties varies between schemes.
Chronic Poverty	Poverty that endures year after year, usually as a result of long-term structural factors faced by the household, such as low assets or location in a poor area remote from thriving markets and services.
Conditionality	The types of conditions CCT beneficiaries are required to fulfil in order to receive transfers. Most conditions involve school attendance, regular visits to health facilities for maternal and child health, and growth monitoring and/or vaccination of infants.
Consumption Gap	The difference between wages and purchases is inevitable when ever profits are extracted. The fact that the consumers have to spend more than what they earn causes what is called the Consumption Gap.
Covariate Shocks/Risks	'Covariate' or 'systemic' shocks are those that by their very nature affect a large number of people sharing some common characteristics such as place of residence or nature of occupation. Examples include natural disasters such as floods and cyclones, and market shocks such as a steep increase in food prices or the sudden drop in the price of a staple crop.
Depth of Poverty	Considering how far, on the average, the poor are below the poverty line.
Disability	The consequence of an impairment that may be physical, cognitive, mental, sensory, emotional, developmental, or some combination of these. A disability may be present from birth, or occur during a person's lifetime.
Disaster Risk Reduction	According to the UN International Strategy for Disaster Reduction, disaster risk reduction means: 'Actions taken to reduce the risk of disasters and the adverse impacts of natural hazards, through systematic efforts to analyse and manage the causes of disasters, including through avoidance of hazards, reduced social and economic vulnerability to hazards, and improved preparedness for adverse events'.
Economic Recession	It is a general slowdown in economic activity. Macroeconomic indicators such as GDP (gross domestic product), investment spending, capacity utilization, household income, business profits, and inflation fall, while bankruptcies and the unemployment rate rise.

Effectiveness	'Effectiveness' refers to the extent to which the programme objectives were achieved, or are expected to be achieved, taking into account their relative importance. Effectiveness measures qualitative and quantitative outcomes in relation to objectives.
Efficiency	'Efficiency' is an economic term which signifies that the intervention is using the least costly resources possible to achieve the desired results. Efficiency measures qualitative and quantitative outputs in relation to results.
Employment Generation Programme for the Poorest (EGPP)	The continuation of the government effort to address the poorest segment of people through creating seasonal employment.
Entitlement	The legally mandated and protected right of an individual to a certain value or benefit. Social security benefits are often established by law and, therefore, can be claimed by entitled individuals on a legal basis. Benefits based on legal entitlements provide superior protection and greater sustainability when compared to schemes that are ad hoc or based on policy decisions only.
Equivalence Scale	An index used in the conversion of nominal household consumption expenditure from heterogeneous households of varying sizes and compositions into a measure of consumption expenditure that is comparable across households through accounting for economies of scale.
Exclusion	The status of individuals that are unable to fully participate and contribute to society as a result of poverty and deprivation, discrimination and lack of effective access to civil, political, social, economic and cultural rights. In social protection it commonly refers to individuals who are eligible for programmes but are not able to access them.
Financial Inclusion	The delivery of financial services at affordable costs to sections of disadvantaged and low-income segments of society, in contrast to financial exclusion where those services are not available or affordable.
FGT Poverty Measures	The headcount index, the PG and PGI and the squared poverty gap index all belong to the Foster-Greer-Thorbecke class of measures. It measures the outfall from the poverty line and is weighted by α. Therefore it is also considering the inequality among the poor but as the proper amount for α is not pre-defined (and a normative question) we cannot say that the Gini is part of the FGT.
Food Aid	Food aid is one form of food assistance which consists of the provision of internationally funded concessional food commodities. Some definitions embrace all interventions that ease access to food, either in food or in cash. This Reference Document adopts a narrower definition.
Food Assistance	Food assistance refers to transfers that directly ease access to food. Food assistance instruments might include direct food-based transfers (e.g. general rations, food-for-work, supplementary feeding or vulnerable group feeding and school feeding), food subsidies, cash transfers and vouchers. Some definitions embrace all interventions that address food insecurity and nutrition (including in-kind food aid, cash transfers and some forms of production and market support). This Reference Document adopts a narrower definition.
Food for Work (FFW)	Such programmes are for construction, maintenance, reconstruction and development of rural infrastructure. Under such programmes both food grains and cash money are allocated to the Upazilas on the basis of population. The schemes are executed by the Upazila Parishad under the supervision of the DC through the District Steering Committee. Upazila allocates the rice/wheat/cash money for FFW schemes to the Unions. The Upazila Parishad selects and prepares the FFW schemes through the UP Chairman and Upazila FFW committee scrutinize the schemes and recommends the schemes to the District Co-ordination Committee who approves the schemes. After approval of the schemes the Upazila Parishad executes the schemes as per circular. Sometimes both food grains and money allocated by the Ministry according to electoral constitution.

Food insecurity	Food insecurity exists when people do not have adequate physical, social or economic access to food as defined next.
Food Security	Food security exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Household food security is the application of this concept to the family level, with individuals within households as the focus of concern.
Food Transfer Versus Cash Transfer	People living in remote areas distant from main markets tend to prefer food transfers, while proximity to markets makes it easier to spend cash on the desired goods. Cultural habits regarding the management of cash resources within households make women more likely to prefer food transfers. Cash transfers are said to be more appropriate (and to generate maximum benefit) right before and during harvests; conversely, food transfers are preferred during the period when household grain stocks have been consumed or sold and grain must be purchased from the market. These factors provide a solid argument for looking at cash and food as complementary and mutually reinforcing transfers.
G2P Payment	Government-to-Person direct payments. Include social transfers as well as wage and pension payments. The broad reach of these payments makes them an obvious candidate for technological solutions of electronic transfer to help increase efficiency as well as expand access to financial services.
Hardcore Poverty	Hardcore poverty is defined as those without a meal a day and a shelter over their head. This is basic human need and it is our responsibility as fellow human beings to provide for our less privileged community.
Head Count Poverty	The percentage of the population whose living standards (typically proxied by consumption) lie below a given threshold referred to as "poverty line".
Human Capital	Human capital refers to the stock of skills, education, health, and personality attributes embodied in individuals and the ability to perform labour so as to produce economic value. It is capital because these properties are an integral part of individuals and productive wealth embodied in labour, skills and knowledge.
Hunger	Hunger is used at population level to describe the situation when dietary intake is below the Minimum Dietary Energy Requirement (MDER). The MDER is the amount of energy needed for light activity and a minimum acceptable weight for attained height, and it varies by country and from year to year depending on the gender and age structure of the population. It is typically taken as an average of 2100 kcal per person per day. Hunger is an outcome of food insecurity.
Idiosyncratic Risks	Risks that are pertinent to a particular person or a household because of the special circumstances in which it finds itself; for example, the death or prolonged illness of the major income earner of the family, or a person losing his/her job.
Incidence of Poverty	Poverty is the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money. Absolute poverty or destitution refers to the deprivation of basic human needs, which commonly includes food, water, sanitation, clothing, shelter, health care and education.
Life Cycle Approach	The meaning of the term "lifecycle" is twofold: Firstly, the lifecycle reflects a continuum of age stages where the needs of individuals change through their life, from conception to death. However, changing needs are not solely related to age, but also to social and economic context. Secondly, the term "life cycle" refers to the different stages and events of life which an individual, and with it often the household, passes through, and which can bring with it a different status given to individuals such as becoming a widow/er, a single mother, an adolescent, or unemployed.
In-kind Transfer	Transfers to individuals or households in a form other than cash, including goods or services (e.g. food/school feeding programmes, free day care services) which aim to reduce poverty. In-kind transfers tend to be used where cash transfers are less appropriate due to weak markets.

Life Cycle Risks	An individual is being exposed to predictable or unexpected risks which vary in nature over the life course. Such risks can be irreversible - stunting due under-nutrition in early childhood, job loss and workplace accidents in economically active age, disability, divorce, poor health in old age, and so forth.
Lower Poverty Line	Extreme poor households whose total expenditures equal the food poverty line, i.e. the cost of the food bundle of the Upper poverty line, but with no allowance for non-food consumption. The Lower poverty line equals an intake of 1,803 kcal per day per person.
Malnutrition	Any deviation from the normal state of nutrition is called malnutrition, which can logically either be under-nutrition or over-nutrition (that includes overweight and obesity). Deficiency of proper nutritional elements due to any cause leads to under-nutrition. Under-nutrition is a broad term ranging from restricted growth of the foetus, low birth weight, stunting, wasting, under-weight to micronutrient deficiencies. It is the outcome of sub-optimal dietary intake, metabolic stress, infectious illnesses, mal-absorption and increased nutrient demands. It includes having poor weight for one's age (underweight), too short for one's age (stunted), thin for one's height (wasted) and being deficient in vitamins and minerals (micronutrient malnutrition). The World Health Organization states that malnutrition is the cellular imbalance between supply of nutrients and energy, and the body's demand for them to ensure growth, maintenance, and specific functions.
Maternal Health Voucher Schemes	Maternal Health Voucher Scheme, a specialized form of demand-side financing programme. To analyse the early lessons from the scheme, information was obtained through semi-structured interviews with stakeholders at the sub-district level. The analysis identified a number of factors affecting the efficiency and performance of the scheme in the programme area: delay in the release of voucher funds, selection criteria used for enrolling pregnant women in the programme, incentives created by the reimbursement system, etc. One of the objectives of the scheme was to encourage market competition among health care providers, but it failed to increase market competitiveness in the area.
Maternity Insurance	The insurance covers part or all of the medical cost during a woman's pregnancy. Coverage is broken down into inpatient and outpatient services. Typically, inpatient coverage includes hospitalization and physician fees associated with child birth.
Means Test	A determination of whether an individual or family is eligible for government assistance, based upon whether the individual or family possesses the means to do without that help.
National poverty Line	This is the percentage of people living below the national poverty line. National estimates are based on population-weighted subgroup estimates from household surveys.
Nutrition	Nutrition is the science of how nutrients and other substances in food act and interact in relation to health and disease. Nutrition is also about the processes by which the body ingests, absorbs, transports, utilises and excretes food substances.
Nutritional Status	Nutritional status is the physiological condition of an individual that results from the balance between nutrient requirements, intake and the ability of the body to use these nutrients.
Open Market Sales	Distribution of stored food grains at prices affordable for poor people. Open market sale also makes it possible to stabilize market prices of food grains during crisis periods. In Bangladesh, OMS covers rice and wheat.
Oportunidades	A government social assistance (welfare) programme in Mexico founded in 2002, based on a previous programme called Progresa, created in 1997. It is designed to target poverty by providing cash payments to families in exchange for regular school attendance, health clinic visits, and nutritional support. Oportunidades has in 2014 been revised with a name change to Prospera.

Poverty	Poverty is a multidimensional social phenomenon characterised by deprivation of basic material, human capability and social requisites for well-being, or vulnerability to such deprivation.
Poverty Gap	Poverty gap ratio is the mean distance separating the population from the poverty line (with the non-poor being given a distance of zero), expressed as a percentage of the poverty line. The ratio is an indicator of the depth of poverty. It measures the aggregate income deficit of the poor relative to the poverty line, and gives an estimate of the resources needed to raise the poor above the poverty line.
Poverty Line	An estimated minimum threshold of income or consumption expenditure that is required to meet the basic necessities of life.
Poverty Profile	How a measure of poverty varies across subgroups of a population (e.g. region of residence) and compares key characteristics of the poor versus non-poor.
Proxy Means Test (PMT)	A mechanism used to select recipients of social protection programmes Proxy means tests generate a score for households based on fairly easy to observe characteristics of the household that serve as proxies for income measurement under true means testing. Such proxies include quality of dwelling, ownership of durable goods, demographic structure of the household, and education and occupations of adult members. The indicators used in calculating this score and their weights are derived from statistical analysis of data from detailed household surveys. Eligibility is determined by comparing the household's score against a predetermined cut off.
Poverty Severity	This takes into account not only the distance separating the poor from the poverty line (the poverty gap), but also the inequality among the poor. That is, a higher weight is placed on those households who are further away from the poverty line. It is measured as the poverty gap squared.
Price Shocks	An unexpected or unpredictable event that affects an economy, either positively or negatively. Technically, it refers to an unpredictable change in exogenous factors—that is, factors unexplained by economics, which may have an impact on endogenous economic variables.
Propensity Score Matching	A quasi-experimental research method attempting to estimate the impact of social transfers on recipients through post-hoc identification of a 'control group' through statistical matching techniques.
Pulse Survey	A survey that monitors the "health" of a situation, programme, context or group of participants. It is usually more focused and specific than a comprehensive monitoring survey and regularly collects selected data to measure trends over time.
Randomized Control Trial (RCT)	An experimental impact assessment methodology utilized in evaluating the impact of social transfers – and other treatments – on outcomes through randomly allocating eligible individuals to control and treatment groups where the effect of social transfers can be observed by comparing outcomes between control and treatment individuals.
Reality Check Approaches	An intensive participatory research methodology involving researchers spending days at a time with families/communities and returning at intervals to repeat, so as to obtain in depth and longitudinal research results.
Result Based Monitoring and Evaluation	Also often referred to as 'Results-based management', which is a broad management strategy aimed at achieving improved performance and demonstrable results in an ongoing process with constant feedback of results to inform actions and decisions.
Risk and Vulnerability	Risk is the combination of the probability of an event and its negative consequences. Vulnerability can be understood as susceptibility to harm from the damaging effects of shocks, resulting from exposure to risks with an absence of capacity to adapt. Risks can be seen as the product of exposure to a shock times the level of vulnerability.

Rural Maintenance Programme (RMP)	RMP evolved from CARE's Food for Development Programme (FFD), a food for work programme which was essentially relief oriented. The core idea for RMP was really very simple. Women had been identified by FFD as a population particularly vulnerable to poverty and it was realized that roads being constructed under the FFD programme needed ongoing maintenance. In 1983 a pilot was begun under FFD which brought these two needs together by employing destitute women in road maintenance.
Seasonal poverty	Poverty, hunger and illness are highly dynamic phenomena, changing dramatically over the course of a year in response to production, price and climatic cycles. When acute hunger or disease occurs, it is not typically due to conflict or natural disaster, but as result of seasonal influences-annually recurring periods when existing harvest stocks have dwindled, little food is available on the market, and prices shoot upward. This results, predictably, in cycles of poverty that can be devastating.
Sentinel Site Monitoring	The process of using selected and key sites from which to collect data over time rather than implementing larger and nationally representative surveys.
Single Registry Management Information System	The Single Registry is an instrument of shared management of Social policies under the control of the central government.
Social assistance	The term 'social assistance' is used by some to refer to social transfers exclusively, and by others to refer to any form of assistance provided to individuals in need on a non-contributory basis (i.e. including social transfers, as well as subsidies, social services, etc.).
Social Development Policy	Primarily refers to guidelines, principles, legislation and activities that affect the living conditions conducive to human welfare.
Social exclusion	Refers to processes in which individuals or entire communities of people are systematically blocked from rights, opportunities and resources (e.g. housing, employment, healthcare, civic engagement, democratic participation and due process) that are normally available to members of society and which are key to social integration.
Social Guarantee	Social guarantees are sets of legal or administrative mechanisms that determine specific entitlements and obligations, related to certain rights, and ensure the fulfilment of those obligations on the part of the State. Social guarantees have five key characteristics: (i) they have a legal expression that results in an explicit State responsibility; (ii) they are constructed in reference to a specific rights holder; (iii) they involve mechanisms of access and redress; (iv) the mechanisms that they envision are defined in a precise manner; (v) they are flexible and revisable. As a result, they facilitate the reduction of opportunity gaps across social groups.
Social Insurance	Contributory benefits that provide transfers on the basis of contribution records and social solidarity. Benefits often include old age, disability and survivors' pensions, unemployment insurance and maternity insurance.
Social Policy	Measures that affect people's well-being, whether through the provision of welfare services or by means of policies that impact upon livelihoods more generally.
Social Protection	Social protection is defined in the European Report on Development as 'A specific set of actions to address the vulnerability of people's life through social insurance, offering protection against risk and adversity throughout life; through social assistance, offering payments and in kind transfers to support and enable the poor; and through inclusion efforts that enhance the capability of the marginalised to access social insurance and assistance'.

Social Protection Floor (SPF)	A United Nations initiative in which countries commit to establishing a minimum level of social protection. It has two basic dimensions: the first is a social security floor that ensures a minimum income for all families, in particular those who are most vulnerable; the other focuses on the obligation by states to provide full access for people to the broad range of essential public services, in particular health and education.
(Social) Safety Net	The term was introduced to refer to a temporary measure to catch those who were transiently made vulnerable through structural adjustment and liberalisation (e.g. transfers to households or subsidy programmes). The term '(social) safety net' is now widely used, sometimes with a different meaning. There is no commonly agreed definition of this terminology, and actors may use it to refer to protective social transfer projects ensuring a minimum level of income (as per the original definition), or (humanitarian) cash transfer projects, or social transfer schemes developed within a broader social protection system (guaranteeing a long-term institutionalised social protection). This Reference Document adopts the original, narrower definition of a safety net as a temporary social transfer project operated outside of government structures.
Social Security	The system of cash transfers provided by countries, comprising both non-contributory and contributory (social insurance) transfers. Social security is recognized as a human right in a range of international human rights conventions.
Social Transfers	In this document, the term 'social transfers' refers to non-contributory, publicly funded, direct, regular and predictable resource transfers (in cash or in kind) to poor and vulnerable individuals or households, aimed at reducing their deficits in consumption, protecting them from shocks (including economic and climatic shocks), and, in some cases, strengthening their productive capacity.
Stunting	'Stunting' describes chronic under-nutrition, characterised by low height compared to age. It occurs over a slow cumulative process as a result of inadequate nutrition and/or repeated infections. It is denoted as <− 2 Z-scores of the median height-for-age according to WHO growth standards for children. Severe stunting is defined as a height-for age index <− 3 Z-scores below the median of the international reference population. It is not possible to reverse stunting.
Supplementary Feeding	Supplementation is the provision of extra nutrients (micronutrients or energy/protein) in the form of food, tablets, capsules, syrups or powders. Supplementary feeding is a standard intervention to prevent malnutrition and to treat moderately malnourished children under five and pregnant and lactating women.
Sustainability	"Sustainability" means "possible to be upheld and defended". For example, when formal and informal processes; systems; structures; and relationships actively support the capacity of current and future generations to create healthy and liveable communities. Socially sustainable communities are equitable, diverse, connected and democratic and provide a good quality of life. It can also refer to bringing about poverty alleviation in ways that can be upheld by households and the environment local communities depend on.
Targeting	The means by which individuals are selected as beneficiaries of social protection programmes.
Transient Poverty	Poverty among households who are poor during some parts of a year but not others, or in some years but not all. They may be poor in some years due to idiosyncratic or covariate temporary shocks ranging from an illness in the household or the loss of a job to drought or macroeconomic crisis. Also called transitory poverty.
Tax-financed	A levy placed on a specific type of monetary transaction for a particular purpose. The concept has been most commonly associated with the financial sector; it is not usually considered to include consumption taxes paid by consumers.

Under-Nutrition	Under-nutrition is the physical manifestation of hunger. It includes intrauterine growth restriction which leads to low birth-weight, stunting, wasting, and deficiencies of essential micronutrients. Under-nutrition results from inadequate food consumption, poor absorption and/or impaired biological use of nutrients.
Underweight	In financial markets, underweight is a term used when rating stock. A rating system may be three-tiered: "overweight", "equal weight" and "underweight", or five-tiered: "buy", "overweight", "hold", "underweight" and "sell". Also used are "outperform", "neutral", "underperform" and "buy", "accumulate", "hold", "reduce", "sell".
Unemployment Insurance	A source of income for workers who have lost their jobs through no fault of their own. Workers who quit or are fired are generally not eligible for unemployment insurance. Workers who are self-employed are also not eligible to receive unemployment insurance and must provide their own rainy-day funds to cover times when no work is available.
Upper Poverty Line	Moderate poor households whose food expenditure is at the food poverty line. The line is defined by Cost of Basic Needs for a bundle of eleven food items corresponding to 2,122 kcal per day per person plus an allowance for essential non-food consumption.
Vulnerable Group Development (VGD)	VGF has been over the years, transformed into Vulnerable Group Development (VGD). About 500,000 women families are getting benefit and each family receives 30 kgs of wheat per month.
Vulnerable Group Feeding (VGF)	VGF is a form of gratuitous relief. This programme is normally launched during disaster and after disaster till the distressed people remaining vulnerable to hunger. It may be stated that the WFP started its relief activities as VGF Programme in Bangladesh among the poorest women from 1975 under projects BGD 2226.
Wasting	Wasting describes acute under-nutrition characterised by low bodyweight compared to height. It is a result of recent rapid weight loss or failure to gain weight. Wasting is measured by the weight-for-height index (< − 2 Z-scores of the median weight-for-height according to WHO growth standards). Severe wasting is defined as a weight-for-height <− 3 Z-scores of the median of the WHO standards. Wasting is readily reversible once conditions improve.
Workfare Programmes	Form of social welfare programme requiring able-bodied adults to work for social transfers (cash or food).

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার